মূল্য ঃ ১০.০০ টাকা

বৈশাখ ১৪২৭
প্রথম সংখ্যা

৭৪তম বর্ষ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (কাঁচের মন্দির)

২, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কোলকাতা- ৭০০ ০৩৬

বিষয়	লেখক/ লেখিকা	পৃষ্ঠা
গান	শ্রীঠাকুর	৭
সম্পাদকীয়		৮
শ্রবণ-মঙ্গলম্	শ্রীসাধনাপুরী	৯
নামকরণ		১১
গান	শ্রীঅর্চনাপুরীমা	১২
নিরর্থক(কবিতা)	শ্রীশরণাপুরী	১২
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেব	১৩
কলিতে নারদীয় ভক্তি	সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	১৭
ব্রত (কবিতা)	অমিতাভ মুখোপাধ্যায়	১৯
প্রচ্ছদ পরিচিতি		১৯
শ্রীরামকৃষ্ণময়তাই হল সাধনা	অধ্যাপক অরিজিৎ সরকার	২০
প্রথম দিনে	স্বামী সত্যানন্দদেব	২১
ভক্তিযোগে ঈশ্বর লাভ	রামানুজ গোস্বামী	২২
বাংলা নববর্ষ বরণ ঃ রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি	নিতাই নাগ	২৬
মনীষী চোখে বিবেকানন্দ	ড. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়	২৮
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য	শ্রী মৃগাঙ্ক ভূষণ নিয়োগী	৩১
ইচ্ছা করে (কবিতা)	দেবব্রত ঘোষ	৩২
মানব জীবনের উত্তরণে চতুর্বর্গ	ব্রহ্মচারী সুনীল	৩৩
পরিপ্রশ্নেন সেবয়া	শ্রী গোলোক সেন	৩৬
স্বামীজীর ভাষায় ঃ বৃহতের চিন্তাই প্রকৃত সার্বজনীন ধর্ম	ড. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	৩৮
বেলা বয়ে যায় (কবিতা)	রিক্তা দত্ত	৪১
প্রথম যেদিন নরেন এল	সুমন ভট্টাচার্য্য	৪২
আমরা তো মানুষ (কবিতা)	সুকুমার দাস	৪৪
‘যত মত তত পথ’—ঠাকুরের এক অনির্বচনীয় বাণী	শ্রীমতী কেকা চট্টোপাধ্যায়	৪৫
“বিজ্ঞান জগৎ এবং আধ্যাত্মিক জগৎ”	সারদা বালা দাসী	৪৬
“নববর্ষের আহ্বান” (কবিতা)	শ্যামাপ্রসাদ কুমার	৪৮
এ যুগের নব ধর্ম (কবিতা)	অরুণ শীল	৪৮
হরিপুরুষ শ্রীশ্রীজগবন্ধু সুন্দর	শ্রীবৈকুণ্ঠ	৪৯
মধুময় (কবিতা)	পরিমল রায়	৫২
আসাম থেকে চেরাপুঞ্জি	সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৩
তোমার কথা.... (কবিতা)	দীপক দাশগুপ্ত	৫৫

সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যপ্রকাশানন্দ ❑ যুগ্ম সহ-সম্পাদক ঃ স্বামী সুবোধানন্দ ও অরুণ কুমার

প্রতি সংখ্যা ঃ দশ টাকা মাত্র ❑ যান্মাসিক ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র ❑ বার্ষিক মূল্য ঃ সডাক একশ টাকা মাত্র

যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

—শ্রীমা সারদাদেবী

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

নবীকরণ ও গ্রাহক ভুক্তি

১৪২৭ বঙ্গাব্দ

'ভাবমুখে'

৭৪ তম বর্ষ, বৈশাখ ১৪২৭ (২০২০-২১) সালের জন্য আপনি 'ভাবমুখে'-এর নবীকরণ করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন।

'ভাবমুখে' পত্রিকার নিয়মাবলী

-ঃ গ্রাহক/গ্রাহিকাদের প্রতি ঃ-

❊ 'ভাবমুখে' মাসিক পত্রিকা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের মুখপত্র। বর্ষ শুরু বৈশাখ মাসে। প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। আশ্বিন সংখ্যাটি বিশেষ সংখ্যা।

❊ গ্রাহক মূল্য ঃ বৈশাখ ১৪২৭ থেকে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য সডাক—১০০.০০ টাকা, ভারতের বাইরে বিমান যোগে—১৫০০.০০ টাকা, আজীবন—৩০০০.০০ টাকা, প্রতি সাধারণ সংখ্যা—১০.০০ টাকা, ষান্মাসিক — ৬০.০০ টাকা। বিশেষ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত কোন মূল্য দিতে হয় না। নমুনার জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠাতে হবে।

❊ বছরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়, কিন্তু কমপক্ষে ৬ মাসের গ্রাহক হলে সুবিধাজনক হয়। বার্ষিক চাঁদা বছরের প্রথমে অগ্রিম দিতে হবে।

❊ আজীবন গ্রাহকদের ক্ষেত্রে এককালীন অথবা বারোমাসের মধ্যে চারবার কিস্তিতে মোট ৩০০০.০০ টাকা দিতে হবে। প্রথম কিস্তিতে ৫০০.০০ টাকা দিতে হবে। ৩০ বছর অন্তে পুনরায় নবীকরণ করতে হবে।

❊ বার্ষিক চাঁদা বৈশাখ মাসের মধ্যে মানি-অর্ডার যোগে, গ্রাহকের নাম, ঠিকানা, গ্রাহক সংখ্যা মানি অর্ডার ফর্মের নীচের অংশে পরিষ্কার করে লিখে ভাবমুখে, পত্রিকা সচিব, ২নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলকাতা-৭০০ ০৩৬, (ফোন ঃ ৯৮৩৬২৪১৫৪৮, ৯২৩০৬১২৮১৭) email : kanchermandir@gmail.com এই ঠিকানায় প্রেরণ করবেন। নতুন গ্রাহক হলে—'ভাবমুখে'র 'নতুন গ্রাহক হতে চাই' কথাটি অবশ্যই উল্লেখ করবেন। চেক বা ড্রাফ্‌ট পাঠালে 'Bhabumkhey' এই শিরোনামে পাঠাবেন।

❊ ভাবমুখের নতুন গ্রাহক হওয়ার জন্য বা পুনর্নবীকরণের জন্য ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা জমা দিলে মোবাইলে মেসেজ বা হোয়াটস্‌ অ্যাপ-এ নাম, ঠিকানা ও কারণ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

Bank Details Only for Bhabmukhey : Head of Account - BHABMUKHEY, Name of Bank - United Bank of India, Baranagar Branch, A/C. No. - 0078010030759, IFSC No. - UTBI0BNG102

❊ ডাকযোগে প্রেরিত পত্রিকা উপযুক্ত সময়ে না পেলে প্রথমে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নেবেন এবং পরে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করে অফিসে জানাবেন।

❊ গ্রাহক/গ্রাহিকার ঠিকানা পরিবর্তন হলে চিঠিতে পুরানো এবং নতুন দুটি ঠিকানাই উল্লেখ করে ইংরাজী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে কার্যালয়ে জানাবেন। চিঠির উত্তর চাইলে রিপ্লাই কার্ড পাঠাবেন।

❊ পুনর্নবীকরণের সময় গ্রাহক নম্বর এবং গ্রাহক/গ্রাহিকার নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন।

❊ এই পত্রিকায় ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শি(া, সংস্কৃতি ও শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা হয়। লেখার আসল কপি পাঠাতে হবে। জেরক্স কপি পাঠালে চলবে না।

❊ কোন রচনা প্রকাশ করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের অভিমত সাপে(।

❊ প্রেরিত প্রবন্ধাদি ফেরত পেতে হলে উপযুক্ত(ডাকটিকিট পাঠানো প্রয়োজন।

❊ ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করে ফেলা হয়।

❊ কোন পুস্তক সম্পর্কে সমালোচনার প্রয়োজন হলে পুস্তকের দুই কপি পাঠানো আবশ্যক।

❊ লেখার বিষয়বস্তুর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব লেখকের।

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে আশ্রম পর্বপঞ্জীঃ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ সাল

১লা বৈশাখ ১৪২৭ (ইং ১৪ই এপ্রিল ২০২০) মঙ্গলবার বাংলা নববর্ষ। সকাল বিশেষ পূজা, হোম ও নাম-গান।

৫ই বৈশাখ ১৪২৭ (ইং ১৮ই এপ্রিল ২০২০) শনিবার একাদশীর ব্রতোপবাস। একাদশীর হোম। একাদশী তিথি—পূর্ব রাত্রি ঘ. ৮।৪ থেকে রাত্রি ঘ. ১০।১৮ পর্যন্ত।

৯ই বৈশাখ ১৪২৭ (ইং ২২শে এপ্রিল ২০২০) বুধবার অমাবস্যার রাত্রে হোম। অমাবস্যা তিথি—প্রাতঃ ঘ. ৫।৩৮ থেকে পরদিবা ঘ. ৭।৫৬ পর্যন্ত।

১০ই বৈশাখ ১৪২৭ (ইং ২৩শে এপ্রিল ২০২০) বৃহস্পতিবার অমাবস্যার ব্রতোপবাস।

১৫ই বৈশাখ ১৪২৭ (ইং ২৮ই এপ্রিল ২০২০) মঙ্গলবার জগৎগুরু শ্রীশঙ্কারাচার্যের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজা। তিথি—(বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী তিথি) পঞ্চমী তিথি পূর্ব দিবা ঘ. ২।৩০ থেকে দিবা ঘ. ৩।৮ পর্যন্ত।

২১শে বৈশাখ ১৪২৭ (ইং ৪ঠা মে ২০২০) সোমবার একাদশীর ব্রতোপবাস। একাদশীর হোম। একাদশী তিথি—পূর্ব দিবা ঘ. ৯।১০ থেকে দিবা ঘ. ৬।১৩ পর্যন্ত।

২৩শে বৈশাখ ১৪২৭ (ইং ৬ই মে ২০২০) বুধবার পূর্ণিমার রাত্রে হোম।

২৪শে বৈশাখ ১৪২৭ (ইং ৭ই মে ২০২০) বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীবুদ্ধ পূর্ণিমা। বিশেষ পূজা ও হোম। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-নারায়ণ পূজা। পূর্ণিমা তিথি—পূর্ব রাত্রি ঘ. ৭।৪৫ থেকে অপঃ ৪।১৫ পর্যন্ত।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ (ইং ১৮ই মে ২০২০) সোমবার একাদশীর ব্রতোপবাস। একাদশী হোম। একাদশীর তিথি—পূর্ব দিবা ঘ. ১২।৪৩ থেকে দিবা ঘ. ৩।৯ পর্যন্ত।

৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ (ইং ২১শে মে ২০২০) বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীফলহারিণী কালী পূজা। সকাল ১০.৩০ মি. থেকে রাত্রি ১টা পর্যন্ত বিশ্বকল্যাণ হোম। অমাবস্যা তিথি—রাত্রি ঘ. ৯।৩৭ থেকে পর রাত্রি ঘ. ১১।৯ পর্যন্ত।

৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ (ইং ২২শে মে ২০২০) শুক্রবার অমাবস্যার ব্রতোপবাস।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ (ইং ২৮শে মে ২০২০) বৃহস্পতিবার সকালে ষষ্ঠী পূজা। জামাই ষষ্ঠী। ষষ্ঠী তিথি—পূর্ব রাত্রি ঘ. ১২।৩২ থেকে রাত্রি ঘ. ১১।২৮ পর্যন্ত।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ (ইং ১লা জুন ২০২০) সোমবার শ্রীশ্রীগঙ্গা দশহরা। সন্ধ্যায় গঙ্গা আরতি।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ (ইং ২রা জুন ২০২০) মঙ্গলবার একাদশীর ব্রতোপবাস। একাদশীর হোম। একাদশী তিথি—পূর্ব দিবা ঘ. ২।৫৮ থেকে দিবা ঘ. ১২।৫ পর্যন্ত।

২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ (ইং ৫ই জুন ২০২০) শুক্রবার জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। পূর্ণিমা তিথি পূর্ব রাত্রি ঘ. ৩।১৬ থেকে রাত্রি ঘ. ১২।৪২ পর্যন্ত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-নারায়ণ পূজা।

ঘরের দেওয়ালের গায়ে লিখিয়া রাখিতে হইবে—"আমি সত্য কথা বলিব ও আমি সাধু হইব।" মনে অহঙ্কার অভিমান আদৌ রাখা ঠিক নয়। সর্ব্বদাই অহঙ্কার বর্জ্জনের চেষ্টা করা উচিত। —***স্বামী অভেদানন্দ***

শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব প্রতিষ্ঠিত

চুয়াত্তর বর্ষ	চৌদ্দশ’ সাতাশ	বৈশাখ	প্রথম সংখ্যা

গান

শ্রীঠাকুর

হে কালবৈশাখী আর দেরী কত
জটায় জটায় জড়ায়ে আনিবে মেঘমালা শত শত।।
শত দুখ আর শত সুখ তব নাচন ভঙ্গে
ছড়ায়ে পড়ুক সকল দিকে
অন্ধকারে নব সৃষ্টির উদ্ভব হোক যত।।
মহাকাল মন্দিরে উঠিবে ধ্বনিয়া শত সহস্র ছন্দ গীতি
শীর্ষে শীর্ষে জাগিবে নিত্য বন্দনা অবিরত।।

—o—

ভাব থেকেই ভাবনা। ভাবনা আমাদের সহজাত। কারণ, ভাবনা ছাড়া আমরা থাকতেই পারি না। এই ভাবনাগুলো আসে যায় ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সংযোগে ভাবনাগুলির জন্ম ও চলাফেরা এবং আসা যাওয়া। প্রধানতঃ দুরকমের ইন্দ্রিয় আমরা জানি স্থূল ও সূক্ষ্ম। একটি ইন্দ্রিয় অন্য ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যে সূক্ষ্ম যোগাযোগ ঘটে চলে নিরন্তর। তা স্থূলভাবে দেখা যায় না ঠিকই; কিন্তু সূক্ষ্মভাবে তাদের ভেতরে আসা যাওয়া আছে। যেমন, চোখ যা দেখে তা মাথার ভেতরে সূক্ষ্ম শিরা উপশিরার মাধ্যমে রূপ-রস-গন্ধের ছবির গুণাগুণ বহন করে ভাললাগা, খারাপলাগা ইত্যাদি গুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে দেয়; তারই প্রকাশ করে মন বাক্যের সাহায্যে; সাহিত্য ও দর্শনে যা আমাদের কাছে বাক্‌প্রতিমা।

সুতরাং ধারণাশ্রিত হয়েই আমরা ঈশ্বরানুগ হতে শিখেছি। এখান থেকেই 'ঈশ্বরের কাছে' অথবা 'ঈশ্বর থেকে দূরে' বিষয়গুলি এসেছে। এইসবই হল ভাবের খেলা। ভাবের প্রকৃত সত্যটিকে না জানা পর্যন্ত আমাদের পার্থিব জীবনে কোনো অগ্রগতিই হয় না। সাধনা তো রসহীন অনুষ্ঠান নয়; এক্ষেত্রে রাগ-অনুরাগ-পূর্বরাগ-প্রেম ইত্যাদি রয়েছে। এইজন্যই দুঃখ এবং তজ্জনিত আকুলতা আমাদের মাঝে মাঝেই পীড়িত করে তোলে। সেক্ষেত্রেই আমরা 'কৃপা'-র কথাটি শুনে আসছি। আমরা নিজেরাও অনেকেই এই কৃপা প্রার্থনা করে থাকি। এই কৃপার অর্থই হচ্ছে করে পাওয়া'—করে পেতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—কৃপা আবার করে পাওয়া কি ? কৃপাতো সব সময় সমান ভাবে সকলের উপর বর্ষিত হয় কিন্তু যার যেমন আধার সে তেমন অনুভব করে। আধার করে নিতে হয়। যেমন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন বৃষ্টির জল সব জায়গায় সমান ভাবে বর্ষিত হয় কিন্তু উঁচু জায়গায় জল জমে না। জমি কেটে নিচু হলে জল জমে। শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব বলেছেন, তিনিই বুঝিয়ে দেন এই এই তখন সে নিজেই বুঝতে পারবে। কোনটা সৎ কোন্‌টা অসৎ। ঈশ্বরই সত্য এই সংসার অনিত্য। এই ধারণা না এলে প্রকৃতভাবে আমাদের পক্ষে সুনির্দিষ্ট পথ ও তার দিশা পাওয়া অসম্ভব। এর জন্য ভাবের প্রয়োজন; 'ভাবনা' যেতে চায় না; অর্থাৎ 'ভাব', তাই 'ভাব-না'। প্রকৃত ভাব না-আসা অবধি সাধনায় অগ্রগতি হয় না। সাধনা তো নিষ্প্রাণ অনুষ্ঠান মাত্র নয়। সেইকারণেই পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য থাকা দরকার। লক্ষ্য স্থির এবং সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়াই একমাত্র পথনির্দেশ।

এই ভাবনায় স্পর্শকাতরতা সময়মতো স্বাভাবিক পর্যায়ে যে তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার ছায়াপাত ঘটিয়ে ফেলে, এবং ফেলবেই—তার মূল্য অপরিসীম। এই ভাবের স্পর্শে একদিকে যেমন সাধনার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়, ইন্দ্রিয়াতীত দোলা লাগে তার মনে। এর ফলে সে অগ্রগতি পায়; মোহজ্ঞান ও তার সত্যতা পরিপুষ্ট হয়। যদিও এই পথে অহঙ্কারের বাসাটি শক্তপোক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে ঐ চেতনার উন্মেষ প্রকৃত ঘটলে, ঐ বিপদকে কাটিয়ে ওঠা যায়। অহঙ্কার এবং ঐশীভাব, এ-দুয়ের সহাবস্থান হয় না; কারণ অন্ধকার ও আলো একসঙ্গে থাকলেও আলোকের ঔজ্জ্বল্য আঁধারকে ঢেকে রাখে সকল সময়। তবে আঁধার আলোর নীচেই অবস্থান করে। সুতরাং সর্বদা সতর্ক থাকা উচিৎ। ভাবজগৎকে সুনির্মল সুন্দর রাখতে গিয়ে নিজেকে সর্বাগ্রে কলুষমুক্ত আনন্দময় করে রাখতে হবে। এই কলুষমুক্ত আনন্দের স্রোতে যদি বা আঁধার রূপ শৈবাল মিশেও থাকে, তা স্রোতের ক্ষুরধারায় জমাট বাঁধতে পারবে না।

ভাবের রাজ্যে এই স্রোত যাতে জোয়ারের প্রাবল্যে ক্ষীণ না হয়ে পড়ে আমাদের এই দিকে সচেষ্ট থাকা দরকার। ঈশ্বর অনুরাগ ও তার উজ্জীবন—এ-এক সুচতুর খেলা। এই খেলায় আমরা সকলে খেলোয়াড় অথবা দর্শক। সবসময় আমরা যদি ঈশ্বরেচ্ছা ও আমাদের ইচ্ছাকে এক করতে পারি অর্থাৎ সমস্ত কর্মের সাথে সাথে অহংকার শূন্য হয়ে তাঁর স্মরণ মনন রাখতে পারি তবেই তাঁর কৃপায় আমরা ধন্য হয়ে যাব।

—o—

শ্রীসাধনাপুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২৪শে পৌষ, ১৩৫৫

শ্রীঠাকুর—তারপর দেখ—বড় হয়ে যেরকম হবে, সেরকম সংস্কার নিয়ে তো জন্মায়ই, ছোট থেকেই তার প্রকাশও হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে। বড় হয়ে যে leader হবে, ছোটতেই তার মধ্যে leader হবার germ ইচ্ছার বা প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন আমি ছোটবেলায় খেলার leader ছিলাম। কলকাতার Crown Club---এর Captain ছিলাম। তারপর দেখ—নেপোলিয়ান যে বড় হয়ে সমস্ত ইউরোপ জয় করে সম্রাট হবেন, ইংরেজদের সঙ্গে যে তাঁর যুদ্ধ হবে, সে তাঁর ছোটবেলা থেকেই বোঝা যেত, উনি সেই শক্তি নিয়েই জন্মেছিলেন। ছোটবেলা থেকেই বরফের গোলা নিয়ে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা খেলতেন। নেপোলিয়ানের মা তো ইংরেজ মহিলা ছিলেন—সেজন্য নেপোলিয়ানের ছোটবেলা ইংল্যাণ্ডেই অনেকটা কেটেছিল। তিনি বিলেতেই থাকতেন। একদিন ইংরেজ বালকদের সঙ্গে খেলতে খেলতে যেই হেরে গেলেন ও আঘাত পেলেন তখন সেই ছোট বয়সেই চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন—'Let the English blood get out of me.' নেপোলিয়ান যে ভবিষ্যতে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন তার germs আগেই থেকেই তাঁর ভিতর ছিল—ওই কথা থেকেই বোঝা যায়।

তারপর আর একটা আছে যে—পারিপার্শ্বিক বা আবেষ্টনী যেমন হবে মানুষের চরিত্র বা স্বভাব গঠন ব্যাপারেও সেটা বেশ প্রভাব বিস্তার করবে। গাছপালা বা উদ্ভিদ্‌জগতের কাছ থেকেও মানুষ কিছুটা পায়; যেখানে গাছপালা খুব বেশী, সেখানকার মানুষ একটা শ্যাম-স্নিগ্ধতা পায়। যেমন দেখ—বাংলার শ্যাম-স্নিগ্ধতা অধিকাংশ মানুষকে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী হবার প্রেরণা দেয় বা ওগুলি এদেশে বেশী; তারপর দেখ—এখানকার সাধু ও মরুভূমির ফকিরের মধ্যে বেশ একটা তফাৎ থাকে। ফকিরদের ওই মরুভূমির রুক্ষ আবহাওয়ায় থেকে তাদের স্বভাবে একটা রুক্ষতা চলে আসে।

সেজকাকা—হ্যাঁ ঠাকুর, আমাদের দোকানে একটী ফকির আসে, সে খুব tall—তো এসেই বলবে 'চা পিলাও গে'—আমিও বলে দিই 'নেহি নেহি'। ওই ফকিরের মেজাজ অমনি খুব রুক্ষ।

শ্রীঠাকুর—আহা, কেন চা দাও না!

সেজকাকা—ভয়ানক রুক্ষভাবে চায়, আর এমনভাবে বলে যেন order করছে। আর প্রায় প্রত্যেকদিনই আসে। যখন ভাল-ভাবে চায় তখন দিই।

শ্রীঠাকুর—তাহলেও তোমার তাকে দেওয়া উচিত—দিও, এক কাপ চা-ই তো!

সেজকাকা—আচ্ছা ঠাকুর; এবার থেকে দেবো—

শ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, ওই শুষ্ক আবেষ্টনীর মধ্যে থেকে ওদের স্বভাব অমনি হয়ে যায়। তারপর বিপরীত আবহাওয়ায়—মানুষ আবার খানিকটা অন্যরকম হয়। যেমন ধর, খুব ধোঁয়া-ভরা ক্লিন্ন জঘন্ন পরিস্থিতির লোক একরকম হয়, আবার উদার উন্মুক্ত প্রকৃতির লোক আর একরকম হয়। এই আকাশ, বাতাস, আলো, সবই আমাদের ওপর react করে। তারপর আরো আছে, যেখানে যেরকম জীবজন্তু থাকে, সেই প্রভাবও খানিকটা পড়ে মানুষের ওপরে। যেখানে পোষা জীবজন্তু আছে—পাখী, কুকুর, পায়রা, গোরু ইত্যাদি, সেখানকার মানুষ স্বভাবতই একটু স্নেহপ্রবণ হয়। কিন্তু যেখানে এসব নেই তারা মোটে এসব সহ্য করতে পারে না। তারপর আছে সামাজিক পরিস্থিতি বা পারিপার্শ্বিকতা—যেখানকার সমাজ যেরকম সেখানকার লোকেরাও সেইরকম। আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থা এখন খুবই খারাপ—না ধার্মিক, না অধার্মিক; স্কুল, কলেজ থেকে ধর্মের ক্লাস উঠিয়ে দিচ্ছে—স্তোত্রপাঠও করতে দেয় না বা দেবে না—এখন ভারতের, বিশেষ করে বাংলার খুব দুর্দিন। রাশিয়া প্রভৃতি দেশে সমাজ-ব্যবস্থা খুব ভাল। সেখানকার সমাজ সাধারণ লোককে দেখে---ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, যুদ্ধবিদ্যা শেখানো ইত্যাদি। সেজন্য দেশের প্রয়োজনে যুদ্ধ করার সময় তারা যোগ

দেয়ও। আমাদের ছেলেমেয়েরা সেসব scope কিছু পায় না, সেজন্য ছেলেমেয়েরা অন্য রকম—বেশীর ভাগই গরীব, খেতে পায় না—অপুষ্ট, ক্ষীণ। আর রাশিয়াতে যেমন বড়লোক থাকতে দেয় না, সেখানকার সমাজ-ব্যবস্থায় অর্থাদি শুধু ধনীদের কাছে না রেখে সকলের মধ্যে সমভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, আর সাধারণ লোকদের সেজন্য উন্নতিরও যথেষ্ট scope আছে। তারপর শরীর সুস্থ বা জীর্ণ থাকার জন্যও স্বভাব-গঠন অনেকটা নির্ভর করে। যেমন আগে হয়তো একটা লোকের পা ভাল ছিল। তারপর কোনো অসুখের ফলে খোঁড়া হয়ে গেল স্বভাবও খানিকটা পাল্টে যায়—কাজেই health-ও একটা কারণ।

জনৈক ভক্ত কোন একজন খ্যাতনামা দেশপ্রেমিকের নাম করে বললেন,—আচ্ছা ঠাকুর, ওই দেশনেতার ছেলে মুসলমান কেন হল?

শ্রীঠাকুর—কি জানি, তাঁর ভেতর হয়ত হিন্দু ও মুসলমান প্রভাব দুই-ই ছিল। কিন্তু হিন্দুর চেয়ে মুসলমান-প্রীতি বেশী ছিল মনে হয়। এই ভাবই হয়ত ছেলেটীর মধ্যে প্রকাশ পেল। এটাও inheritance-এর একটা দিক। তিনি মুসলমানদের খুব ভালবাসতেন। হিন্দুদের স্বাধীন করবার ইচ্ছাও যেমন ছিল, তেমনি আবার মুসলমানদের ভালবেসে হিন্দুদের কতকটা ক্ষতিও করেছেন।

জনৈক—ক্ষতি করেছেন?

শ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, এই হিন্দুস্থান-পাকিস্থান বিভাগ হওয়ার ফলে দেশ ভাগ হয়ে গেল ও কত অসংখ্য নরনারী ভিটেমাটী-ছাড়া, দেশ-ছাড়া, নিরন্ন হয়ে গেল বল তো? রবীন্দ্রনাথের মত বাধা যদি কেউ দিত তাহলে অসংখ্য নরনারীর এই দুর্দশা তো হত না।

এই সুযোগে অনেকে অনেক মন্তব্য করতে সুরু করলেন রাজনীতি সম্বন্ধে, শ্রীঠাকুর এসব শুনে বললেন—

শ্রীঠাকুর—ওসব কথা এখন থাক্, আর না। সেই যে বলেছিলাম কোন কিছুই টেঁকে না, আত্মিক না হলে। হয়তো কোন একজন লোক ভাল ছিল না—হঠাৎ সাধু হয়ে গেল—তাই বলে তার ছেলে তো সাধু হবে না। কারণ সেই সাধুত্ব তার আত্মিক নয়—আত্মিক স্বভাব হলে সেই সাধুত্ব তার ছেলে কিছু-না-কিছু পেতো। যেমন বৈদিকযুগে ঋষিরা বহু তপস্যা করেছিলেন, ত্যাগ করেছিলেন তাই আজও তাঁদের বংশধররা ধর্মপ্রবণ—ত্যাগ-তপস্যা তাঁদের আত্মিক জিনিষ ছিল, তাই আজও এত রাষ্ট্রীয় বিপ্লব, যুদ্ধ, মারামারি, এত জাতির অভ্যুদয়, এত বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও আমাদের মন থেকে ধর্ম একেবারে যায়নি। যেমন আমার গা থেকে একটু মাংস যদি ছিঁড়ে নাও, তার ভিতরেও আমার সত্তা পাবে। কেননা এটা আমার আত্মিক জিনিষ। সেজন্য সাধু আসন, বসন এইসব সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণের চল আছে। সাধুর চরণামৃত নিলেও লোকের কল্যাণ হয়।

তারপর ওই যে free will আর determination এই নিয়েও বহু তর্ক হয়ে গেছে। বহু মতবাদ আছে—কেউ মানে free will কেউ মানে determination কিন্তু আমার মনে হয় দুটীই সত্য। ঠাকুর বিরাট, তিনি সব ঠিক করে রেখেছেন—এও যেমন সত্য, আবার আমাদের ভিতর ক্ষুদ্র হয়ে ঢুকে তিনিই লীলা করছেন—এও তেমনি সত্য। তাঁরও স্বাধীন ইচ্ছা আছে। যেমন রাজার ছেলে তার তো রাজ্য ঠিক হয়ে আছে। তবুও সে প্রজাদের কাছ থেকে খানিকটা নেয়। পিতার কাছ থেকে খানিকটা নিয়ে বিলাস করে। রাজার ছেলের সব ঠিক হয়ে আছে, আবার তার নিজস্ব ইচ্ছাও আছে। কাজেই দুটীই সত্য। আবার রাজার ছেলে আমাদের ভিতর নানা ভাবে লীলা করছেন, নানা বন্ধনের সৃষ্টি করছেন। সবই তো তিনি। তিনিই determination করেছেন, আবার free will-ও তাঁরই। তিনি বন্ধনও সৃষ্টি করেছেন, আবার এগিয়েও চলেছেন। উপনিষদে তাঁকে বলে 'পিতানোহসি'---রাজাই বলো আর পিতাই বলো—তিনিই সবের মূলে। এক রূপে ছেলে হয়ে আমাদের ভিতর ঢুকে স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করছেন—আবার আর এক রূপে determine করছেন। তিনিই লীলা করছেন, আবার তাঁর যখন মনে হবে তখন সৃষ্টি-স্থিতি সব গুটিয়ে নেবেন। লয় হয়ে যাবে।

স্যার—একটা পত্রিকায় লিখেছে প্রলয় বলতে কিছুই নেই। সমষ্টি-মনের চিন্তার পরিবর্তনই প্রলয়।

শ্রীঠাকুর—জায়গাটা আমাদের একবার দেখিও। কি হিসেবে বলেছে, না দেখলে বলা যাবে না। তবে প্রলয় মানে কি জান—কার্য্য-কারণে লয় 'নাশঃ কারণ লয়ঃ'—এই সৃষ্টিরূপ কার্য্য—যখন সেই কারণে লয় হয়ে যাবে, তখনই প্রলয়।

স্যার সৃষ্টি সম্বন্ধে আর একটা কথা বললেন। তার উত্তরে শ্রীঠাকুর বললেন—

শ্রীঠাকুর—কে বললে পূর্বে ছিল না—সব-কিছুই এককালে হয়ে আছে। তবে প্রকাশ হয় দেরীতে। এই যে নানারকম Ism, এগুলোও নতুন নয়—বীজাকারে আগেও ছিল। Sociology, Communism—ইত্যাদি সবই আগে ছিল—'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্'—ঋষিরা চিন্তা করেছিলেন, কেউ পরের ধন নেবে না—এগুলোর মধ্যে তো রয়েছে ওই Communism ইত্যাদির কথা। মনের পরিবর্তনের কথা বললেন, সেটী individual মনের পরিবর্তন হতে পারে, যেমন লালাবাবুর ক্ষেত্রে হঠাৎ পরিবর্তন, কিন্তু এই পরিবর্তন প্রলয় নয়। ঠাকুর তাঁর সৃষ্টি নিয়ে এখন লীলা করছেন আর চাইছেন সৃষ্টি বিলসিত হোক—আবার যেদিন নিজে হাতে গুটিয়ে নেবেন—বলবেন 'না, আর থাক'—ক্ষান্ত হবেন, সেদিনই হবে প্রলয়।

বইখানি আবার পড়া শুরু হল। কিছুক্ষণ পরে স্যার বললেন,—ঠাকুর, দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ হয়ে গেল।

শ্রীঠাকুর---একি! স্বামীজী ওই বংশগত ধারা, পারিপার্শ্বিক চাপ, জাতিগত ধর্ম—সব বাদ দিলেন, শুধু বেদান্তের কর্মফল ছাড়া আর কিছু মানলেন না; আমি বাপু সবই নিই। বিবেক স্বামীর কিন্তু এক জায়গায় বলা আছে যে আত্মা পূর্বজন্মের সংস্কার নিয়ে অনুকূল আবহাওয়ায় বা বংশে জন্ম নেবার চেষ্টা করে—কিন্তু আমাদের স্বামীপাদ কেন বাদ দিলেন বল তো? খুব জ্ঞানী ছিলেন কিনা, খালি বেদান্তকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

স্যার—হ্যাঁ ঠাকুর, কালী মহারাজ চরম বেদান্তবাদী ছিলেন।

শ্রীঠাকুর—কর্মফল ছাড়া—পিতামাতার চালচলন, কথা বলা, তাছাড়া আরও কিছু ছেলেরা পায়। দেখ, বুনো ঠিক ওর বাবার মত হাসে—অথচ কতটুকু থেকে আশ্রমে আছে।

স্যার—হ্যাঁ ঠাকুর, কথা-বলা ও সবই প্রায় ওর বাবার মত।

শ্রীঠাকুর—বুনো যদি তার বাবার কাছে থাকত, তাহলে না হয় তো পাওয়াটা আশ্চর্যের হত না। কিন্তু সরে এসেছে, তবু কি করে পায়—সেজন্য সবকিছুর মধ্যেই দেখি সত্য আছে। ও সংস্কারের প্রভাবও যেমন সত্য, বংশধারা, পারিপার্শ্বিক প্রভাব, সামাজিক প্রভাব, জাতিগত প্রভাব, আবার কোন শক্তিমান মহাপুরুষের প্রভাব সবই সত্য, আর এদের অনেক কিছুই মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে।❑

❖ নামকরণ ❖

পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ(লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—''দ্বাদশবর্ষব্যাপী অদৃষ্টপূর্ব অলৌকিক তপস্যান্তে শ্রীশ্রীজগদম্বা ঠাকুরকে বলেন—'ওরে, তুই ভাবমুখে থাক।' ঠাকুরও তাই করেন।''

'ভাবমুখে' কথাটির অর্থ ব্যাপক এবং আধ্যাত্মভাবে পূর্ণ। মনের সমস্ত বৃত্তি লোপ পাওয়ার পর মন যখন সংকল্প রহিত হয়ে সমাধিভূমিতে অবস্থান করে—তখন তাঁর মুখের কথাই 'ভাবমুখে'-র কথা রূপে প্রকাশিত হয়।

অধ্যাত্মজগতের প্রতি আকর্ষক আহ্বান হিসাবে শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব এই পত্রিকার 'ভাবমুখে' নামকরণ করেন।

এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব ছিলেন রামকৃষ(ময়। তাঁর জীবনের প্রতিটি স্পন্দনে অনুরণিত হত শ্রীরামকৃষ(-সারদা প্রেমভাব, যার স্ফুরণ দেখা যায় তাঁর রচিত গানে, কবিতায়, প্রবন্ধে ও জীবনের প্রতিটি ছত্রে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাপার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তিম লীলাস্থল কাশীপুর উদ্যানবাটী ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগী সন্তানদের দ্বিতীয় স্মৃতি বিজড়িত আলমবাজার মঠ উদ্ধার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। কাশীপুর উদ্যানবাটীটি পরে বেলুড় মঠকে হস্তান্তর করেন। অনুরূপে দক্ষিণেশ্বরে মায়ের স্মৃতিবিজড়িত নহবতখানায় মন্দির ট্রাস্টীদের সহায়তায় মায়ের পটমূর্তি স্থাপন করে পূজা ও আরাত্রিকের প্রথম ব্যবস্থা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ সকলের কাছে পৌঁছে দিতেই তিনি প্রকাশ করতে শু(করেছিলেন এই ***'ভাবমুখে'*** পত্রিকাটি। এই পত্রিকাটির মাধ্যমে তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের, শ্রীমায়ের ও তাঁদের লীলাপার্ষদদের বিভিন্ন ঘটনা এবং আদর্শকে তুলে ধরতেই আমাদের এই নিরন্তর প্রয়াস।

শ্রীঅর্চনাপুরীমা

ওগো ও বৈশাখী দিন
সবুজ পাতার লগ্ন ভোলো
এখন শুধু জমছে তোমার
ঝরা পাতার ঋণ ॥
তৃষ(া কাতর কেকার ডাকে হায় রে
নিঠুর মেঘের মন ভেজাতে চায় রে
কে যেন একলা বাজায়
ভাঙা বুকের বীণ ॥
ধূ ধূ রোদ মাঠের কোলে
আগুনের তুফান তোলে।
বুঝেছি গো এই যে জ্বালা নেভার নয়
তেমন মেঘের উদয় বল কোথায় হয়
যে বাদল আনবে গো সেই
সজল পায়ের চিন ॥

—০—

শ্রীশরণাপুরী

রূপরেখার তীরে
ঐ যে হলুদ কাঠের নৌকাটা
আপন মনে দুলছে
যাওনা ওর কাছে
কাছে গেলেই ও তোমাকে বলবে
শোন—
আমি প্রতিদিন সাগরে স্নান করতাম,
অপার আনন্দে ডুবে থাকতাম,
তার বিশালতায় হারিয়ে যেতাম—
কিন্তু একদিন এমন একটা
টাইফুন উঠলো
তাতে সমস্ত পৃথিবী উত্তাল হয়ে উঠলো
ওদিকে দিক দেশ সব
অন্ধকার হয়ে গেল
তারপর থেকেই
আমি এমন নিঃসঙ্গ
বেদনার্ত
আর
নিরর্থক জীবন
বহন করে চলেছি।

—০—

নববর্ষের শুভেচ্ছা

'ভাবমুখে' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত(সমস্ত কলাকুশলী, পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, সকল শুভানুধ্যায়ী এবং সকল ভক্ত(বৃন্দকে 'ভাবমুখে' পত্রিকার প(থেকে নববর্ষের হার্দিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি। প্রার্থনা জানাই শ্রীঠাকুরের চরণে আমরা যেন নুতন বর্ষের দিনগুলিতে প্রীতি-ভালবাসা-শ্রদ্ধা ও আনন্দের সুসমন্বয়ের মাধ্যমে কাটাতে পারি। শ্রীঠাকুর আমাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ক(ন।

—সম্পাদক

তোমরা পূজার ঘরটিকে ধূপে, সুরভিতে, ফুলে, নামে, গানে, ঠাকুরের মূর্তিতে এমন করে ভরিয়ে রাখবে—যেখানে ঢুকলেই মনটা আপনি উঁচু স্তরে উঠে যাবে।

—শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবেরভাবাদর্শের আলোকে বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়মূলক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও আধুনিক যুগসম্মত বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেব

চতুর্থোহধ্যায়ঃ

জ্ঞানযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ—তীব্র বৈরাগ্য নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে লেগে থাকাই সংশিতব্রত।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি॥ ২৯

তথা অপরে (আবার অন্যান্য যোগিপুরুষ) অপানে প্রাণং (অপান-বায়ুতে প্রাণবায়ু), প্রাণে অপানং (প্রাণবায়ুতে অপানবায়ু) জুহ্বতি (হোম করেন) অপরে নিয়তাহারাঃ (আবার কেউ বা সংযত আহারের দ্বারা) প্রাণাপানগতী (প্রাণ ও অপানবায়ুর গতি) রুদ্ধা (দমন করে), প্রাণায়ামপরায়ণাঃ (প্রাণায়াম সহযোগে) প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি, (ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রাণসমূহে আহুতি প্রদান করেন)।

আবার কোন কোন যোগী বা সাধক অপানবায়ুতে প্রাণবায়ু আহুতি দেন।(কেউ বা) প্রাণে অপানের আহুতি দেন, অন্য কেউ বা আহারের সংযম অভ্যাস করে প্রাণ ও অপানের গতিরোধপূর্বক প্রাণায়াম সহযোগে ইন্দ্রিয়গণকে প্রাণে আহুতি দেন॥ ২৯

অপরে নিয়তাহারাঃ—এখানে বিভিন্ন প্রকার তপস্যাকে বা সাধনাকে যজ্ঞ বলেছেন।প্রাণায়ামের পূরক, রেচক ও কুম্ভক এই তিনটী পর্য্যায়ের কথা বললেন।আবার বলেছেন যারা সামান্য মাত্র আহার করে ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্ব্বতোভাবে সংযত করে তারাও যজ্ঞ করছে।তারা অতি সামান্য মাত্রা আহারাদির দ্বারা মনকে সংযত করে এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে পঞ্চপ্রাণে আহুতি দেয়।অতি ভোজনে শরীর স্থূল হলে যোগ বা সাধনায় যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটে। অতিভুক্ত খাদ্য জীর্ণ করতে শরীরের অনেক পরিশ্রম করতে হয়, আবার এখানে 'আহার' অর্থে ইন্দ্রিয়ের অথবা ইন্দ্রিয়ের বিষয়েও হতে পারে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় হতে মন সরিয়ে বা সংযম করলে আত্মস্থ বা ভগবৎমুখী হওয়ার সুবিধা হয়, তজ্জন্য 'নিয়তাহারাঃ' কথার ব্যবহার করেছেন।

সর্ব্বেহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্॥৩০
নায়ং লোকোহস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম॥৩১

এতে সর্ব্বে অপি (এই সকল) যজ্ঞবিদঃ (যজ্ঞবেত্তাগণ) যজ্ঞক্ষয়িত-কল্মষাঃ (যজ্ঞসহায়ে নিষ্পাপ) (ভবন্তি) যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ (অমৃততুল্য যজ্ঞপ্রসাদ-ভোজনকারিগণ) সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি (সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন) (যে) কুরুসত্তম (কুরুশ্রেষ্ঠ), অযজ্ঞস্য (যজ্ঞাচরণহীন ব্যক্তির) অন্য কুতঃ (অন্য লোকে উন্নতি কোথায়)?

এই যজ্ঞানুষ্ঠানকারী সকলেই যজ্ঞ দ্বারা পবিত্র হয়ে থাকেন; যাঁরা অমৃততুল্য যজ্ঞপ্রসাদ ভোজন করেন তাঁরা সনাতন ব্রহ্মপদ লাভ করেন। হে কুরুপ্রধান! যে মানুষ কোন রকম যজ্ঞই করে না—তার ইহলোকেই উন্নতি বা শান্তি নেই, তো পরলোকে কি হবে? ৩০।৩১

সর্ব্বেহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতঃকল্মষাঃ—এযুগে তো বেদমত চলে না সেজন্য 'যজ্ঞ' অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রীতির জন্য, তিনিই ঘটে ঘটে বিলাস করছেন এই চিন্তা নিয়ে দীননারায়ণের সেবা, অক্ষমদের গরীবদের জন্য দান ইত্যাদিই যজ্ঞ এবং কলিতে জপযজ্ঞ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। গীতাতেই অন্যত্র বলেছেন যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি', কাজেই এইভাবে চলতে চলতে 'ক্ষীণকল্মষঃ' হয়ে বা ভগবৎকৃপায় সম্পূর্ণ 'ক্ষয়িতকল্মষাঃ' হয়ে যায়।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্মসনাতনম্—আগেকার দিনের নিয়ম অনুসারে, যজ্ঞকালে অন্ন, ফল, পিষ্টক, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ইত্যাদি উৎসর্গ করা এবং অবশিষ্ট যজ্ঞপ্রসাদ ব্রাহ্মণ, অতিথি, দীন, আর্ত্ত—এদের দান করে যজ্ঞকারী, সর্ব্বশেষে সেই প্রসাদ দেবতার প্রসন্নতায় সমবেত অতিথি নারায়ণ, ব্রাহ্মণ, দীন, আর্ত্ত—এঁদের সকলের অমৃততুল্য হয়ে উঠতো এবং ভক্ষণে মনে তৃপ্তি আসত এবং চিত্ত ভগবৎমুখী হয়ে যেত। কাজেই যজ্ঞাবশিষ্ট যথার্থই অমৃততুল্য; লোভ, স্বার্থপরতা সত্য সত্যই এতে কমে যায়।

কিন্তু এখনকার লোকে তো বৈদিক যজ্ঞ করে না, এখন কি উপায়? এখন জপ করে ইষ্ট উদ্দেশে নিত্য নিত্য ভোগ নিবেদন করে প্রসাদ গ্রহণ করলে এবং যতটা পারা যায়, সেই প্রসাদ ভক্তদের ও দীনদুঃখীদের মধ্যে কিছু বিতরণ করে কেবলমাত্র শরীর-রক্ষার্থে যে ভোজন সেটিও অমৃততুল্যই হয়ে থাকে। এমন অনেকে থাকে দেবোদ্দেশে ভোগ দেয়, কিন্তু সবটুকু নিজের লোভ বা স্বার্থ পুরণার্থে ব্যয় করে, কিন্তু অন্ততঃ কিছুটা ঠাকুরের সৃষ্ট জীবের মধ্যে বিতরণে মনের প্রসারতা, নির্লোভতা বাড়ে এবং তখনই অমৃতভক্ষণ করা হয়।

নায়ং লোকোহস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম— শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ গীতার যুগে না করলে সে ব্যক্তি বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম লঙ্ঘন করার জন্য তৎকালীন সমাজেই হেয় প্রতিপন্ন হয়ে দুঃখ ভোগ করত। কাজেই স্বধর্ম পালন না করার জন্য তারা পরলোকেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এই ছিল সামাজিক আদর্শ। বৈদিক যজ্ঞ পরবর্তী কালে সম্ভব হল না, কাজেই গীতায় ভগবান যতটা পারা যায় নিষ্কাম কর্ম্মযজ্ঞ বা সর্ব্বোপরি জপ যজ্ঞের কথা বললেন। এখন এইলোকে অর্থাৎ এই জগতেই যদি মানুষ দেবোদ্দেশে অগ্রভাগ নিবেদন না করে প্রসাদ বা ভগবানের প্রসন্নতা লাভ না করে, অর্থাৎ তাঁদের প্রসাদ ভক্ষণে যে চিত্তের প্রসাদ সেটী যদি লাভ না করে তাহলে পরকালে সে কি করে মুক্তি লাভ বা মোক্ষলাভ করবে? যারা ঈশ্বরের প্রীতির জন্য এই লোকেই কিছু করে না তারা পরলোকে গিয়ে কি করে পরা গতি লাভ করবে? আর পরা গতি লাভের ইচ্ছাই বা কি করে হবে? এই জগতেই যদি ভগবৎ-চাহিদা না জাগে তাহলে পরলোকে গিয়েও সে ইচ্ছা জাগবে না; আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত পরলোকের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করা। আমরা যখন চাকুরী করি তখন যেমন বৃদ্ধবয়সের জন্য ব্যাঙ্কে টাকা সঞ্চয় করি, তেমনি আমাদের দেহ ছেড়ে একদিন তো যেতেই হবে, কাজেই ঐ ব্যাঙ্কে টাকা জমানোর মত ইহজীবনে নিত্য নিত্য প্রত্যেকেরই উচিত কিছু কিছু জপ, ধ্যান, সৎকর্ম্ম ইত্যাদি পরলোকের পাথেয় হিসাবে সঞ্চয় করা। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষ ইহজগতের ভোগসুখেই মত্ত থাকে, পরলোকের কথা চিন্তা করে না আর মৃত্যুর অন্ধকারে প্রেতদেহে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ করে। সেজন্য সেই নেদারল্যাণ্ড (netherland) ব্যাঙ্কের জন্য আমাদের নিত্য অন্ততঃ ভগবৎ-স্মরণ, ভগবৎ-প্রীতির উদ্দেশ্যে সামান্য কিছু কিছু করা সকলেরই একান্ত উচিত।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষসে।।৩২

ব্রহ্মণঃ মুখে (বেদমুখে) এবং বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ (এইরূপ বহুরকম যজ্ঞ) বিততা (বর্ণিত আছে, অথবা ব্যাখ্যাত হয়েছে); তান সর্ব্বান (সেই সমস্ত) কর্ম্মজান্ বিদ্ধি (কর্ম্মোদ্ভুত জানিও) এবং জ্ঞাত্বা (এইরূপ জেনে) বিমোক্ষসে (মুক্তিলাভ করবে)?

এই প্রকার অনেক যজ্ঞকথা বেদমুখে বর্ণিত হয়েছে। এই সবই কর্ম্মজাত জানবে, অর্থাৎ কায়িক, বাচিক ও মানসিক—এই তিন কর্ম্ম হতে সৃষ্ট বলে জানবে, এইটী জানলে মুক্তিলাভ করবে।।৩২

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।।৩৩

(হে) পরন্তপ! দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ (দ্রব্যময় যজ্ঞ হতে) জ্ঞানযজ্ঞঃ (জ্ঞানময় যজ্ঞ) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ); হে পার্থ! অখিলং সর্ব্বং কর্ম্ম (জগতের সমস্ত কর্ম্ম) জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে (জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে)।

হে শত্রুতাপন! দ্রব্যসাধ্য বেদোক্ত যজ্ঞ হতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ; কেন না, ফলের সঙ্গে সমস্ত কর্ম্ম নিঃশেষে জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে।।৩৩

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্—গীতায় 'দ্রব্যযজ্ঞ' বলতে ঘৃত, মধু, তণ্ডুল, কুশ, কাষ্ঠ ইত্যাদি দ্রব্য সাহায্যে দেবতার উদ্দেশে যে সকাম যজ্ঞ, তাকেই 'দ্রব্যযজ্ঞ' বলা হয়েছে।

জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ—দ্রব্যময় নৃযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ হতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। এই সকল দ্রব্যময় যজ্ঞে স্বর্গলাভ বা কামনার পরিপূর্ত্তি হয়, কিন্তু মোক্ষলাভ বা ব্রহ্মলাভ হয় না। ব্রহ্মলাভ করতে হলে জ্ঞানযজ্ঞের প্রয়োজন। নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারা কামনা-বাসনা বর্জ্জিত হয় ও অহং-বুদ্ধি ক্রমশঃ লোপ পায় এবং সর্ব্বত্র সমদর্শন হয়। এই সাম্যবুদ্ধি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়ে আত্মা সম্পূর্ণ সমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অবস্থার নাম 'জ্ঞান'। গীতামতে কিন্তু

সমস্ত কর্ম্ম বিসর্জন দিয়ে জ্ঞান লাভ করার কথা বলা হয় নি। গীতায় নিষ্কাম কর্ম্মযোগের মাধ্যমেই জ্ঞান লাভ করার কথা বলা হয়েছে।

সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে—সর্ব্বকর্ম্ম এখানে অন্তরের কর্ম্ম বাহিরের কর্ম্ম সবই বুঝিয়েছে। 'জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে' বলতে গীতামতে কিন্তু 'জ্ঞান' অর্থাৎ পুরুষোত্তম জ্ঞান। পুরুষোত্তমই জীবভূত সনাতনরূপে ঘটে ঘটে বিলাস করছেন, তিনিই সব করছেন, জীব শুধু নিমিত্ত মাত্র এই জ্ঞানই গীতার জ্ঞান, —এইবোধে কর্ম্ম করলে সব কিছুই সেই পুরুষোত্তমের যজ্ঞের আহুতিতে পরিণতহয়।

এখানে একটী প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সমস্ত কর্ম্ম পরিসমাপ্তি লাভ করে জ্ঞানে—তা এ যুগে দেখা যাচ্ছে কর্ম্মপদ্ধতি ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে, মঠ, মিশন, আশ্রম ইত্যাদি সর্ব্বত্রই কর্ম্ম সমাপ্ত না হয়ে ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে, এ যুগের সাধুদের আশ্রমে পর্যন্ত নিরন্তর কর্ম্ম বেড়ে যেতে দেখা যাচ্ছে, অথচ গীতার বাণী 'জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে' —অর্থাৎ পরিসমাপ্তি ঘটে, কিন্তু কেন এযুগে তা হয় না, তদুত্তরে বলা যায় যে, যুগ প্রভাব একটা আছে তো—তখনকার যুগের চাহিদা ছিল অন্যরূপ, প্রভাবও ছিল অন্যরূপ, কাজেই মানুষের কর্ম্ম পদ্ধতিও কমে যেত। তখন ব্রাহ্মণ ও সাধুদের একটা নিষ্কিঞ্চন ভাব ছিল আর তাদের কিছু ভাবতেও হত না, এমনকি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-প্রভাবে সংসারীগণও বানপ্রস্থ গ্রহণ করে চলে যেত বনে। কিন্তু এ যুগের প্রভাব মানুষের চাহিদা, কর্ম্মচক্র বাড়িয়ে দিচ্ছে। সাধুর আশ্রম যত চাকচিক্যযুক্ত হবে, যত লক্ষ লক্ষ টাকার scheme যুক্ত হবে, তত সেখানে লোকও যাবে। দীনের কুটীরে কে যাচ্ছে? কাজেই কর্ম্মপদ্ধতি কমছে না, এটী হচ্ছে যুগপ্রভাব।

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥৩৪

প্রণিপাতেন (প্রণামান্তে বা প্রণাম দ্বারা) পরিপ্রশ্নেন (আধ্যাত্মিক প্রশ্ন দ্বারা) তৎ বিদ্ধি (ভগবৎ-জ্ঞান লাভ কর বা ভগবানকে জান); জ্ঞানিনঃ (শাস্ত্রজ্ঞ) তত্ত্বদর্শিনঃ (তত্ত্বদর্শী বা ভগবানকে লাভ করেছেন, এমন পুরুষ) তে জ্ঞানম্ উপদেক্ষ্যন্তি (তোমাকে আত্মজ্ঞান উপদেশ করবেন)।

গুরুচরণে প্রণামান্তে আধ্যাত্মিক নানা বিষয়ে প্রশ্ন দ্বারা এবং সেবা দ্বারা গুরুকে প্রসন্ন করে সেই জ্ঞান লাভ কর। জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী গুরু তোমাকে সেই ভগবৎ-জ্ঞান উপদেশ করবেন ॥৩৪

এখানে Law of thermodynamics এর ২য় Law অনুসারে energy কখনও উর্ধ্বস্তরে বিস্তৃত হয় না। Energy always flows from higher to lower potential অর্থাৎ বৃহৎ শক্তি থেকে energy dissipated হয়ে lower level-এ প্রবাহিত হয়। যতই difference of potential বেশী হবে, আচার্য্য শক্তি বিচ্ছুরিত হয়ে যত বেশী জমা হবে। কাজেই গুরুশক্তি, আচার্য্য শক্তি ধরতে গেলে যত নীচু হবে ততই কৃপা বেশী হবে। আর Hydrostatics-এর Law অনুসারে জল সব সময়ই higher level থেকে lower level-এ জমা হয়। কাজেই কৃপাবারি ধরতে গেলে উঁচু বা অহংকৃত হলে হবে না। নীচু হতে হবে।

পরিপ্রশ্নেন সেবয়া—'পরিপ্রশ্ন' অর্থাৎ সম্যক্ গভীর প্রশ্ন। এ কথার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করলে বলা যায় theory of resonance-এর কথা। এই theory-তে বলে, একই সুরে বাঁধা অনেকগুলি বাদ্য যন্ত্রের একটী যন্ত্রে যদি আঘাত করা যায় তাহলে সেই vibration বা কম্পনে সেই সুরে বাঁধা অন্যান্য যন্ত্রগুলিতেও শব্দতরঙ্গ বা সুরতরঙ্গ সৃষ্টি করবে। কাজেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভার্থে যদি আমাদের মনকে পরিপ্রশ্নের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা জিজ্ঞাসার উপযুক্ত করে tune করি তাহলে গুরুর কাছ থেকে ব্রহ্মবিদ্যা জিজ্ঞাসার উত্তররূপ resonance বা vibration automatic ভাবেই পেয়ে যাব। তিনি ব্রহ্মবিদ্যার উত্তর না করে থাকতে পারবেন না। এখানে মনে রাখতে হবে যে মনের সূক্ষ্মতা বা sharpness যত বেশী হবে তত resonance হবে, আর damping বেশী হলে vibration কম হবে। যেমন তবলা ইত্যাদি যন্ত্রে vibration কম হবে, হবে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তারের যন্ত্রে vibration বেশী হবে।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ—পূর্ব্বশ্লোকে

যে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে এইখানে সেটী লাভের উপায় বলা হয়েছে। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটীর দ্বারা গুরু বা আচার্য্যের সন্তুষ্টি লাভ হলে তবে তো জ্ঞান লাভ হবে। কথা তিনটী বলার মধ্যেও লক্ষ্য করার বিষয় আছে, আগে প্রণিপাত তারপর পরিপ্রশ্ন তারপর সেবা, এগুলি ক্রম ব্যবহারিক জগতে খুবই স্পষ্ট এবং প্রয়োজনীয়। আমরা স্বতঃই দেখতে পাই যে, যখনই আমরা কোন মহাত্মা, সাধু, গুরু বা গুণী ব্যক্তির কাছে যাই বা তাঁদের সন্তোষ আকাঙ্ক্ষা করি তখন প্রথমেই প্রণিপাত প্রয়োজন; এইভাবে কিছুদিন যাতায়াতের পর তাঁর প্রীতি হলে তখন তাঁকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার সাহস হয় বা প্রশ্ন করাটা ঠিক হয়। আরও যখন এগিয়ে যাই, আলাপ জমে ওঠে, তখন সেবার অধিকার পাই।

এইটীর দুটি অর্থ হতে পারে, যেমন প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটির দ্বারা যাঁর কাছে আমরা জ্ঞান বা কৃপা লাভ করবো, তাঁর হৃদিস্থিত হৃষীকেশের তুষ্টি বা কৃপা লাভ করবো ও জ্ঞানলাভের পথ সরল হয়ে যাবে। আর একটা হচ্ছে যে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা মনকে নিরহংঙ্কার, নম্র, বিনয়ী করে নিতে হয়। ঠাকুরের বলা আছে উঁচু জমিতে জল জমে না, নীচু জমিতে জল জমে। কাজেই কৃপালাভ করতে হলে এই প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা মনকে নীচু করা, কৃপা জমবার মত আধার তৈরী করা। এই দুটি একসঙ্গে না হলে কৃপালাভ করা যায় না। যে কোন গুরু, সে পাঠশালার পণ্ডিত থেকে আরম্ভ করে মস্তবড় বিদ্বান, জ্ঞানী বা যে কোন বিষয়ে গুণী তাঁদের কাছেও কৃপালাভ করতে হলে, তাঁদের প্রীতির জন্য তাঁদের সেবাযত্ন করতে হয়, তুষ্ট করতে হয়, এমনকি অনেকের জুতো পর্যন্ত বয়ে দিতে হয়। জ্ঞানলাভ তবে তো হবে। এ হল সাধারণ জ্ঞানের গুরুর কথা, কিন্তু এখানে বলা হয়েছে 'জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ'—অর্থাৎ যিনি পুরুষোত্তমতত্ত্ব দর্শন করেছেন, পুরুষোত্তমতত্ত্ব অবগত হয়েছেন, তিনি তত্ত্বদর্শী। যাঁর বাক্যের দ্বারাই, আশীর্বাদের দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান স্ফুরিত হবে, ভগবৎ-লাভ হবে। যেমন আমরা বৈদিক যুগে আরুণি উপমন্যু প্রভৃতির জীবনে দেখি গুরুভক্তির দ্বারা, গোসেবা, ক্ষেত রক্ষণ ইত্যাদি সেবা কাজেই দ্বারাই, গুরুর প্রসন্ন আশীর্বাদে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। শাস্ত্র অধ্যয়ন তপস্যা ইত্যাদি কিছুরই প্রয়োজন হয় নি। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য তোটকাচার্য্যের ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উদাহরণ আমরা পাই। এদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ একমাত্র গুরুবাক্যেই সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই আছে আকুল গুরুভক্তি, গুরুসেবা। কাজেই দেখা যাচ্ছে, গীতা জ্ঞানলাভের এই যে ক্রম বলে দিয়েছেন—এটি খুব সত্য।

যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥৩৫

[হে] পাণ্ডব! যৎ জ্ঞাত্বা (যা জেনে) পুনঃ এবং মোহং (পুনরায়-এইরূপ মোহ) ন যাস্যসি (প্রাপ্ত হবে না); যেন (যার ফলে) অশেষাণি ভূতানি (বিশ্বের সর্ব্বজীব) আত্মনি (আত্মাতে) অথ ময়ি (পরিশেষে আমাতে) দ্রক্ষ্যসি (দেখবে)।

হে পাণ্ডব! যে জ্ঞান লাভ করলে পুনরায় এরূপ (শোকাদি-জনিত) মোহাভিভূত হবে না, এবং জ্ঞান দ্বারা সমস্ত ভূতমধ্যে আত্মদর্শন এবং অনন্তর আমাকে দেখতে পাবে॥৩৫

যজ্জ্ঞাত্বা—যে জ্ঞানের দ্বারা পুরুষোত্তমকে জানা যায়।

যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি—এই জ্ঞান লাভ হলে সমস্ত মোহপাপ ছিন্ন হবে, তখন সর্ব্বভূতকে নিজ আত্মার মধ্যে দর্শন করবে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে। তারপর সেই জ্ঞান পুরুষোত্তম জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করবে, অর্থাৎ সর্ব্বভূতে আত্মদর্শনের পর আবার পুরুষোত্তমের মধ্যে আত্মদর্শন ও সর্ব্বভূতকে দর্শন করবে।

অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্রে সম্মুখ-সমরে আত্মীয়-স্বজনকে বধ করতে হবে—এই ভেবে গভীরভাবে মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন। দুর্য্যোধনাদি আত্মীয় ছিলেন, কিন্তু খুব অত্যাচারী ছিলেন, অধর্ম্মাচরণও করতেন। এইরকম অত্যাচারী রাজাকে স্বয়ং ভগবান যখন বধ করার প্রেরণা দিচ্ছেন তখন সেখানে অর্জ্জুন অনিচ্ছা প্রকাশ করছেন আর এটির মানেই হচ্ছে মোহগ্রস্ত হওয়া। সেইজন্য ভগবান বললেন—'যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহ' ইত্যাদি। (ক্রমশঃ)

কলিতে নারদীয় ভক্তি

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়েছিল। তার আর ফেরা হল না। সমুদ্রে গুলে গেল। আমি মাপতে গিয়েছিলাম 'কালের সমুদ্র—কালসমুদ্র', নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পাচ্ছি না। বিন্দু হয়ে হারিয়ে গেছি 'কালসিন্ধু' তে। আদি, অন্তহীন হে মহাকাল! কার সাধ্য তোমাকে খণ্ড খণ্ড করবে! আতঙ্ক নিয়ে ফিরে আসি বিন্দু-প্রায় নিজের এই অস্তিত্বে। 'কালচক্র' ধীর গতিতে ঘুরছে। যুগের পর যুগ আসছে, যাচ্ছে। কে যায়? কাল তো স্থির একটি মহাসমুদ্র। জীবন—সে তো বুদবুদ! জলের বিম্ব জলেতেই যেমন মিলায়, সেইরকম কালের আধার মানুষও প্রাণের ঘড়িতে সময়ের হিসেব রাখে। সংখ্যা—সে তো মানুষের হিসাব! ওই আসে, ওই যায়। ঘটনার ঘনঘটায় ইতিহাস তৈরি হয়। পাণ্ডুলিপির পাতা বাড়ে।

অখণ্ড কালকে আমরাই খণ্ড খণ্ড করি। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারটি যুগ। চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে। প্রভু! আমাদের হিসাবটা একবার দেখুন ঃ

সত্যযুগের আয়ুষ্কাল— ১৭,২৮,০০০ বছর।

ত্রেতা— ১২,৯৬,০০০ বছর।

দ্বাপর—৮,৬৪,০০০ বছর।

কলি—৪,৩২,০০০ বছর।

আর যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের প্রয়োজন আছে কি? কয়েক কোটি খুচরো, খোলামকুচি সময়ের অতল অঙ্গনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকি। যা দেখেছি, যা শুনেছি, যা দেখিনি, সব মিলিয়ে জ্ঞানের জগৎটিকে খাড়া রাখার বিকট প্রচেষ্টা। সবটাই একটা গল্প যেন!

মহারাজ! আপনি দ্বাপরের শেষ রাজা। পাণ্ডুবংশের শেষ প্রতিনিধি। রাজা পরীক্ষিৎ! আপনার বিরুদ্ধে আমার কিছু নম্র অভিযোগ আছে। আপনি এই বৃক্ষতলে বসুন। একদিন এই মূলে আপনার জীবনদাতা পাণ্ডব-সুহৃদ শ্রীকৃষ্ণও বসেছিলেন। সে-সব অতীতের কথা। রাজন! আপনি খুব সাজতে ভালবাসেন। মৃগয়ায় যান রাজপোশাকে। মাথায় সোনার মুকুট। গলায় সোনার হার, হীরা, জহরত। আমার অনুরোধ, আপনি আরামদায়ক পোশাকে এই অপূর্ব উদ্যানে, এই ছায়াতরুতলে কিছুক্ষণ বসুন। আপনি দ্বাপরের সীমানা অতিক্রম করে কলিকালে প্রবেশ করেছেন। পেছনে পড়ে আছে কত লক্ষ বছর। দেবপঞ্জিকা মানবপঞ্জিকা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। শুনবেন সেই হিসাব। আমি শাস্ত্র থেকে উদ্ধার করে এনেছি। পৃথিবীর এক বছর দেবলোকে দেবতাদের একদিন একরাত। পৃথিবীর তিন কোটি ষাট বছর দেবতাদের এক বছর। দেবতাদের বারো হাজার বছর (অর্থাৎ আমাদের বারো হাজার x তিন কোটি ষাট বছর) এক দিব্যযুগে। এক-একটি দিব্যযুগের এক একটি নাম—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। মহারাজ আমরা বসে আছি কলিযুগের প্রারম্ভে। আপনি আছেন, আপনি থাকবেন—কিন্তু আমি এক সামান্য মানুষ জোনাকি তুল্য, ক্ষণ-পরমায়ু; আমি কীভাবে, কোন স্পর্ধায় আপনার সামনে বসে আছি? মহারাজ! এর উত্তর, আমি হলাম—'জিজ্ঞাসা', চিরকালীন 'প্রশ্ন'। আপনি আমাকে পাবেন বেদ আর উপনিষদের পাতায় পাতায়। আচার্যের অধিকারে জ্ঞান, শিষ্যের মনে প্রশ্ন, এই সৃষ্টি বিরাট এক রহস্য, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে রোমাঞ্চ। মহারাজ! আমি প্রশ্ন, আপনি উত্তর। সময়—সে এক পরম বিস্ময়। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মারও মৃত্যু আছে। ব্রহ্মার আয়ু একশো বছর। না, আমাদের বছর নয়, অনন্তের ঘড়ি। এই হিসাব শুনলে আপনার মাথা ঝিমঝিম করবে। ব্রহ্মার একশো বছরের হিসাবটা আপনাকে শোনাই—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি একত্রিত হয়ে এক দিব্যযুগ। দেব পরিমিতি বারো হাজার বছর। কিন্তু না, এই বিষয়ে আলোচনা করার কোনও অর্থ হয় না। ঋষিদের বেদ বিজ্ঞান চর্চা। কল্পনাও বলা যেতে পারে তবে যথেষ্ট সুগঠিত। একটা কথাই তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন, আদি-অন্তহীন এই সৃষ্টি। সময়ের শুরু সৃষ্টির শুরুতে। একটা সময় তো ছিল, যখন কিছুই ছিল না। অবতার তত্ত্ব। দশ অবতার। তারপরে 'মনু'। এক-একজন মনু সাতটি দিব্যযুগ (অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই দিব্যযুগ) ভোগ করেন। এইরকম চোদ্দোজন মনু। চোদ্দোজন মনুর সাত দিব্যযুগ, অর্থাৎ আঠাশটি দিব্যযুগে ব্রহ্মার একদিন। ব্রহ্মার আয়ু একশো বছর, তারপর তিনি নিজেতে লয় হয়ে যান। না, রাজন! মাথা খারাপ করে লাভ নেই,

আপনাকে আমার প্রশ্ন, আপনি কেন হাতে পেয়েও সেই দুরাচারী দুষ্টটাকে ছেড়ে দিলেন?

কার কথা, কোন দুষ্টের কথা তুমি বলছ?

ওই যে, যে-গ্রন্থখানি, যে শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত আপনার কারণেই এই ধরায় অবতীর্ণ হয়ে যুগ যুগ ধরে ভক্তহৃদয়ে ভক্তিহিল্লোল তুলবে, সেই শ্রীমদ্ভাগবতে—এই শুনুন মহর্ষি ব্যাসদেব কী লিখে গেছেন আপনার সম্পর্কে!

একদিন হেরে রাজা আপন নয়নে।
অদূরে কাঁদিছে গাভী নিয়ত পীড়নে।।
বৎসহীন মাতা সম কাঁদে ধরা পরে।
তার পার্শ্বে এক বৃষ বিষাদে বিচরে।।

মহারাজ! এই বৃষটি হল ধর্ম আর গাভীটি হল ধরণী। এদের বাক্যালাপ আপনি স্বকর্ণে শুনেছিলেন। আপনি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছিলেন, বৃষরূপী ধর্মের চারটি পা থাকা উচিত, কিন্তু রয়েছে মাত্র একটি পা। অপর তিনটি কোথায় গেল। কোন নিষ্ঠুর সেই তিনটি পদ কর্তন করল? মনে পড়ছে মহারাজ! আপনারই রাজ্যে, আপনারই শাসনে, কোথা থেকে এসে হাজির হয়েছে এক মহাপাষণ্ড। কালো কুচকুচে, আবলুশ কাঠের মতো গায়ের রং। সে আবার রাজা সেজেছে! আপনাদের আমলে এই এক সমস্যা—রাজারা সবসময় রাজা সেজে থাকেন, ব্রাহ্মণরা সবসময় ব্রাহ্মণের সাজে, চৌকিদার মাথায় পাগড়ি। সুন্দরীরা অপ্সরা, ডানা মেলে উড়ে গেলেই হল। ধনসম্পদে ভরা এই ভারত। রাজার শাসনে প্রেম ছিল, প্রজাবৎসল।

কিন্তু, এ একটা কে? কোথা থেকে এল এই উটকো উৎপাত। কুরুক্ষেত্রের শ্মশান থেকে? এ কি কৌরবপক্ষের শেষ কোনও রাজা! অথবা প্রেত! কী অসীম এর ধৃষ্টতা! অকারণে এই বৃষটিকে নিপীড়ন করছে, শান্ত গাভীটি সাশ্রুনয়নে অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছে।

আমার রাজ্যে এ কী উদ্ধত অনাচার! মাতার গর্ভে আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছি। তিনি আমাকে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র থেকে রক্ষা করেছিলেন। আমার পিতা যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মৃত্যু স্বীকার করেছিলেন। আমার পিতামহগণ ধর্ম ও বীরত্বের প্রতীক! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপাধন্য। সর্বকালের সব যুদ্ধের শেষ ঘন্টা বেজেছিল কুরুক্ষেত্রে। রক্তাক্ত ভূমিতে উঠে দাঁড়িয়েছে নতুন ভারত। পুরাণের কাল প্রবেশ করেছে ইতিহাসের কালে। সিংহাসনে আরোহন করবে আমারই এক পুত্র জনমেজয়।

নিশ্চয়! আপনার সব অহংকারই আমরা মেনে নেব। ব্যাসদেব সবই বলে গেছেন। বলে গেছেন, কী কারণে আপনার নাম রাখা হল পরীক্ষিৎ! নামটি অতি সুন্দর। মাতৃগর্ভেই আপনার কৃষ্ণদর্শন হয়েছিল। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর আপনি এই মনুষ্যলোকে সর্বদাই তাঁকে খুঁজতেন, 'এই কি সেই?' মানুষ দেখলেই আপনি মেলাবার চেষ্টা করতেন, 'এই কি সেই দিব্যপুরুষ, জ্যোতির্ময়?'

স এষ লোকে বিখ্যাতঃ পরীক্ষিদিতি যৎ প্রভুঃ।
গর্ভে দৃষ্টমনুধ্যায়েন্ পরীক্ষেত নরেস্বিহ।। (ব্যাস)

মানুষ দেখলেই অভিমন্যু-পুত্র 'এই কি সেই মাতৃগর্ভে-দৃষ্ট পুরুষ' মনে করে পরীক্ষা করতেন বলে তিনি পরীক্ষিৎ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। আপনার জন্মের পর ভাগ্যগণনাকারী ব্রাহ্মণগণ বলেছিলেন, 'কালের প্রভাবে কুরুবংশ ধ্বংসোন্মুখ হলে, তা রক্ষার জন্য ভগবান কৃপা করে এই বালককে দান করেছেন'—

তস্মান্নাম্না বিষ্ণুরাত ইতি লোকে ভবিষ্যতি।
ন সন্দেহো মহাভাগ মহাভাগবতো মহান। (ব্যাস)

আপনি ভগবানের অনুগ্রহের দান। অবশ্যই। সেই কারণে আপনার আর একটি নাম—'বিষ্ণুরাত'। ভগবানের দান নিকৃষ্ট হতে পারে না; সর্বোত্তমই হবে। অতএব এই বালক হবে অশেষ গুণসম্পন্ন, পরম ভাগবত মহাভক্ত। 'মহাভাগ মহাভাগবতো'। ভাগ্য গণনাকারীদের এই সিদ্ধান্ত। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আরও জানতে চান বিস্তারিতভাবে। এই বালক আমাদের একমাত্র উত্তরপুরুষ, আমাদের কীর্তি, আমাদের গৌরব কি রক্ষা করতে পারবে? ইক্ষ্বাকু বংশের ঐতিহ্য!

উত্তরে তাঁরা ধর্মরাজকে আশ্বস্ত করে বললেন, এই বালক যথাকালে ইক্ষ্বাকুর মতোই হবে। সাক্ষাৎ ইক্ষ্বাকু। 'ধর্মরাজ! শুনে রাখুন এই বালক কালে কেমন হবে, রামচন্দ্রের মতো প্রজাপালক, সত্যনিষ্ঠ, ব্রাহ্মণদের হিতকারী, শিবিরাজার মতো দাতা, শরণাগতের রক্ষাকারী, ভরতের মতো কীর্তিশালী, পার্থের মতো বীর। অগ্নির মতো তেজ ধারণ করবে। সিংহের মতো পরাক্রম। হিমালয়ের মতো সাধুদের আশ্রয়স্থল, পৃথিবীর মতো ক্ষমাশীল।' তালিকা বাড়তে বাড়তে বিরাট হয়ে গেল। পরীক্ষিৎ

ভগবান। সমস্যা অনেক। পুরাণের সঙ্গে ইতিহাসকে মেলাতে গিয়ে গবেষকরা দু'জন পরীক্ষিৎ আবিষ্কার করলেন। পরীক্ষিৎ—এক, পরীক্ষিৎ—দুই। প্রথম পরীক্ষিৎ রয়েছেন অথর্ববেদে। দেবতারা তাঁর গুণগ্রামে ধন্য ধন্য করছেন। ইন্দ্র তাঁকে দিচ্ছেন অলৌকিক শক্তি। চন্দ্র, সূর্য দিচ্ছেন আলো। সেই একটা সময় ছিল, যখন স্বর্গের দিকে এই ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর অনেক দরজা খোলা ছিল। দেবতারা হামেশাই চলে আসতেন। সুন্দরী অপ্সরারা পৃথিবীর সরোবরে স্নান করতেন। হিমালয়ের শিখরে শিখরে দেবতা আর দেবীদের বৈঠকখানা। কোনও গুহায় ঋষিরা তপস্যা করছেন হাজার বছর ধরে। কোনও গুহায় পাঁচ হাজার বছর ধরে ঠায় বসে আছেন কোনও স্বনামধন্য অসুর। বড় মজার জায়গা। দু'পক্ষই চাইছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের কৃপা। পরস্পর যুদ্ধ করবেন তাঁরা স্বর্গের অধিকারের জন্যে। স্বর্গ হল ভোগের রাজ্য, পৃথিবী দুর্ভোগের। মানুষের বরাত কোনকালে খুলবে হে ভগবান!

মহারাজ! আপনার পূর্বপুরুষরা যখন ধুন্ধুমার যুদ্ধে ব্যস্ত, সেই সময়েই কাল কিন্তু কলি-তে প্রবেশ করেছে। দ্বাপর শেষ। অবশ্য কোনও কোনও হিসাবে বলা হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানেই ধরাধামে কলির আগমন। তিনিই সব গুটিয়ে নিয়ে পৃথিবীকে লীলাশূন্য করে কোথায় চলে গেলেন! নীরব তাঁর মোহন বাঁশি। অনাথ গাভীকুল। তাঁর লীলা-সহচরীরা দিশাহারা। 'নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার'। প্রেমিক হলে কী হবে বড় নিষ্ঠুর আপনার সেই পিতামহ। (ক্রমশঃ)

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

সাগর সেচে রত্ন পেয়েছি
বিবেক মন্ত্র বলে।
রামকৃষ(ইষ্টজপে হৃদয়পুর হতে
মা সারদার আশিস্ মাথায়
ডিঙিয়ে সাত নদী পাহাড়।
দু'চোখেতে অনল বোধ নিয়ে
রাতকাটিয়ে দিনের আলোয়
'জীবে সেবা শিবধর্ম'
জীবন ব্রত হবে। ❑

সব্বাই কি তাঁকে ধরতে পারে? তিনি ভাললোক করেছেন, মন্দ লোক করেছেন, ভক্ত করেছেন, অভক্ত করেছেন–বিশ্বাসী করেছেন, অবিশ্বাসী করেছেন। তাঁর লীলার ভিতর সব বিচিত্রতা, তাঁর শক্তি কোনখানে বেশী প্রকাশ, কোনখানে কম প্রকাশ। সূর্যের আলো মৃর্তিকার চেয়ে জলে বেশী প্রকাশ, আবার জল অপেক্ষা দর্পণে বেশী প্রকাশ। —**শ্রীরামকৃষ্ণদেব**

প্রচ্ছদ পরিচিতি

প্রচ্ছদ চিত্রটিতে ষ্টার থিয়েটারে নটী বিনোদিনী অভিনীত **শ্রী চৈতন্য** নাটকটি দেখার পর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে নটী বিনোদিনীর দিব্য সাক্ষাৎকারের চিত্রটি প্রকাশিত হয়েছে। শ্রী চৈতন্য নাটক দেখে মুগ্ধ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব নটী বিনোদিনী সহ সমস্ত সহঅভিনেত্রীদের আশীর্বাদ করছেন।

এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব ছিলেন রামকৃষ(ময়। তিনি কঠোর ১৪বছর সিউড়ীতে তপস্যা করা পর শ্রীশ্রীরামকৃষ(আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর জীবনের প্রতিটি স্পন্দনে অনুরণিত হত শ্রীরামকৃষ(-সারদা প্রেমভাব, যার স্ফুরণ দেখা যায় তাঁর রচিত গানে, কবিতায়, প্রবন্ধে ও জীবনের প্রতিটি ছত্রে। এই ভাব সকলের কাছে পৌঁছে দিতেই তিনি প্রকাশ করতে শু(করেছিলেন এই 'ভাবমুখে' পত্রিকাটি।

চিত্রটির পরিমার্জিত রূপদান করেছেন নিতাই মুখার্জী। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করেছেন স্বামী সত্যপ্রকাশানন্দ ও অ(ণ অধিকারী।

অধ্যাপক অরিজিৎ সরকার

সমগ্র পৃথিবীর এই চরমতম সংকটময় দিনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত যেন আমাদের জীবনে ও মননে বারংবার মনে করিয়ে দিচ্ছে ঈশ্বরই সত্য এবং তাঁর ইচ্ছাতেই সব সম্ভব হয়। আর তাই কথামৃত ভাবলেই চোখের সামনে ভেসে উঠছে এক ব্যক্তিত্ব —তিনি শ্রীম। কথামৃতকার। তাই কথামৃত যেন 'মহেন্দ্র-শ্রীরামকৃষ্ণ-সংবাদ' হয়ে উঠেছে। সমগ্র কথামৃত জুড়ে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রায় এগারটি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। খুব বেশি ব্যবহার করেছেন চারটি ছদ্মনাম—মণি, মাষ্টার, ভক্ত ও মোহিনী। এই সব নামের আড়ালে আসলে শ্রীম ঠাকুরকেই সাধনা করেছিলেন। হয়ে উঠেছিলেন রামকৃষ্ণময়। শাস্ত্র সাধনা বা তপস্যার সংজ্ঞা হিসেবে বলা হয়েছে—'সুখত্যাগে তপোযোগঃ সর্বত্যাগে সমাপনম্।' অর্থাৎ সর্বতোভাবে সুখকে ত্যাগ করাই তপস্যার প্রাথমিক কথা। ধাপে ধাপে হয় সর্বত্যাগ। তখন 'আমি' বা 'আমার' ভাবটি চলে যায়, আসে 'তুমি', 'তোমার'।

শ্রীম দর্শনেও আমরা এই প্রসঙ্গে শ্রীম-র সঙ্গেও ভক্তদের সংলাপ পাই। একজন ভক্ত যখন প্রশ্ন করলেন—আমাদের আশা নাই; এদিক ওদিক কোনটাই হল না। তাঁর কথা পালন করতে পারছি কৈ? মাস্টারমশাই তখন ঠাকুরের প্রসঙ্গ টেনে উদ্ধৃত করে বলেন যে ঠাকুর একজন ভক্তকে বলেছিলেন—'তোদের জন্যই যত ভাবনা, বিয়ে করে ফেলেছিস। ওরা বিয়ে করেনি অত ভাবনা হয় না ওদের জন্য।' অর্থাৎ ভবগান আমাদের মত গৃহস্থ সংসারীদের জন্য ভাবছেন। কারণ—Complicated difficult Case। এই প্রসঙ্গে শ্রীম ভক্তদের জানিয়েছিলেন যে ভোগ-ত্যাগের নামই সন্ন্যাস। তাই গৃহে থেকেও হয়, তবে কঠিন। শ্রীমদর্শনে তাই চার থাকের সাধুদের কথার উল্লেখ আছে। প্রথম থাকের সাধু খুব earnest ব্যাকুল ভগবানের জন্য; trivial matters (তুচ্ছ জিনিস)-এঁরা চান না। দ্বিতীয় থাকের সাধুরা afraid of Contamination অর্থাৎ স্পর্শদোষকে খুব হানিকর মনে করেন। তৃতীয় শ্রেণীর ওঁরা লৌকিকতা চান। এঁদের সংখ্যা খুব কম। আর চতুর্থ থাক indifferent(উদাসীন)—কোনও লক্ষ্য নেই এদিকে। ভক্তি বা সম্মান পায়ে ধরেই কর বা যুক্ত করেই কর বা না-ই কর তাঁর গ্রাহ্য নেই এ সবে।

তাই ঠাকুরের শ্রীমুখের কথার সূত্র ধরে শ্রীমও সাধুদের নারায়ণজ্ঞানে পূজা করা—not to pay respects but to worship. কারণ— ঠাকুরের প্রধান উপদেশ ছিল সাধুসঙ্গ। শ্রীম তাই বলতেন—সাধুসঙ্গই হল ভবরোগের মহৌষধ—It is a remedy for all diseases. সাধুসঙ্গ ধরে থাকলে অন্য সব সাধন নিজে থেকেই হয়ে যাবে। গোবৎসকে ধরে রাখলে গাভী যেমন হাম্বা হাম্বা রবে ছুটে আসে তেমনি সব আপনি আসবে।

শ্রীম ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ঠাকুরের অলৌকিক জীবনের প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি ছিলেন বহু ঘটনার সাক্ষী। তিনি নিজে স্বয়ং বহু ঘটনা অনুভব করেছিলেন। তাই এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার আগে তিনি রেখে গেলেন বিশ্বজনীন আদৃত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। মাস্টারমশাই নিজে বলতেন—'কথামৃত' আমাদের কোনও কল্পনা করা বস্তু নয়, যা দেখেছি, যা শুনেছি তা রিপোর্ট করেছি। স্বয়ং বলতেন—এটা আমার প্রতিবেদন। তাই বলা যায় কথামৃত হল শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীম-র হলফনামা বা affidavit.

দুর্দিনে যখন আমরা বিচলিত হয়ে যাই তখনও ভাবতে হয় ঈশ্বরনির্ভরতার কথা। শ্রীম দর্শনে উল্লেখিত একটি প্রসঙ্গ এসে পড়ে। কলিকাতায় একটি অনাথ আশ্রম ভেঙ্গে গিয়ে অনেকগুলি বালক মারা যায়। এই কথা উল্লেখ করে শ্রীম বলেছিলেন ভক্তদের প্রতি যে তাঁর কাজ মানুষ কি বুঝবো? বলেছিলেন—এই দেখুন না, এতিমখানা ভেঙে গিয়ে এক কোপে তেতাল্লিশ জনকে নিয়ে গেল—এক হাঁড়িকাঠে। নিষ্পাপ শিশু সব, পাঁচ বার নামাজ পড়তো। লোকে ভাবে, ঈশ্বরের কি অবিচার। কিন্তু আমরা তাঁর কাজের কতটা দেখতে পাই কি-ই বা বুঝি! ১৮৮৫ সালের বন্যায় অনেক লোক মারা গেল। অনেকে বলতে লাগলো, ঈশ্বরের কি অবিচার! শুনে ঠাকুর উত্তর করলেন, 'আচ্ছা তিনি যদি এদের আরো ভাল স্থানে নিয়ে গিয়ে থাকেন?'

সকলেই চুপ এক কথাতেই। এই যে কাণ্ডটা হল, এতে কত শিক্ষা লাভ হচ্ছে। প্রথম, এরা সব নিষ্পাপ, হয়তো এদের নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। দ্বিতীয়, লোকের সব চৈতন্য হল পুরানো বাড়ী সব repair (সংস্কার) করতে লাগল। কর্পোরেশন, গভর্ণমেন্ট সকলের দৃষ্টি এখন এদিকে। তৃতীয়, ভক্তরা শিখবে, দেহ কখন চলে যেতে পারে। তাই তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকতে আরম্ভ করবে। সংসার একাট মহাশ্মশান। চতুর্থ, যাদের একটি ছেলে মারা যায় তারা শোক থেকে বিরত হবে। একসঙ্গে ৪৩ জন গেল, তাদের জন্য কে কাঁদছে? আর আমরা একটির জন্য কাঁদছি—এ সান্ত্বনা এদের আসবে।

তাই ঈশ্বরের কাজের মন্তব্য করা উচিত নয়। আমরা উপর উপর একটু দেখেই বিচার করি কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার পরিসমাপ্তি রামকৃষ্ণময়তায়। বুঝতে হবে ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত কিছু হবার নয়। তিনি বোঝালে তবে আমরা বুঝতে পারি। মানুষের কর্ম নয় তাঁর কাজ বোঝা।

—০—

প্রথম দিনে

স্বামী সত্যানন্দদেব

জীবনের প্রথম পাতা আর শেষ পাতা—দুটির লেখাই রহস্য মেদুর। বৎসরের প্রথম দিন অনাগত দিনগুলির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। কত আঁধারই না ঘনিয়ে আছে সেখানে নিরাশাবাদী ভাবে। আবার আশাবাদীর মনেও জাগে নূতন দিনের আলো। জীবনের প্রথম দিনেও সকলে ভাবে শিশুর অনাগত ভবিষ্যৎ। আশা নিরাশার দোলা এখানেও মানুষের মনকে দেয় দুলিয়ে, জন্মকুণ্ডলি হয় প্রস্তুত—বিধাতা পু(ষের লিখন জেনে নিতে। কেউ কেউ আবার এসব চিন্তার কথা মনেই করে না। ভাবে যেমন দিন আসে তেমনি আসবে। ভাবনা চিন্তার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে তা তারা বোধ করে না। এদের কাছে কবি গ্রের ভাষায়—

'Where ignorance is bliss
It is fooly to be wise.'

সেক্সপীয়র এক জায়গায় বলেছেন ঃ—

'To fear the worst off' cures the worst.'

তাই প্রথম দিনেই আমাদের ভবিষ্যতের প্রতি একটা সসীম দৃষ্টি রাখা ভালই মনে হয়। দুঃখ দুর্দিনের জন্য আগে থেকে তৈরী হয়ে থাকলে তার থেকে উদ্ধার পাওয়া সহজ হয়। শ্রীঠাকুরও বলেছেন—প্রথম অবস্থায় অনেক কষ্ট করতে হয়, অন্যদিকে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় বাসুদেব অর্জুনকে উপদেশ দিলেন,—

অব্যক্ত(াদীনি ভূতানি ব্যক্ত(মধ্যানি ভারত
অব্যক্ত(নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।

জন্মের আগে ও মৃত্যুর পর দুই অজ্ঞাত। কেবল বর্তমানই প্রকাশিত। অতএব দুঃখের কারণ নাই। বর্তমানকে ঠিক রেখে চলাই কর্তব্য।

পশু ও মানুষের মধ্যে পার্থক্যের একটি প্রধান কথা হচ্ছে যে, পশুরা বর্তমানের মূল্য নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। মানুষের প্রগতি তার দূরদর্শিতা। অনাগত দিনের জন্য প্রস্তুতি তার জীবনবেদ। এতেই গড়ে উঠেছে বিরাট এই সভ্যতা। আমরা শুধু বর্তমান নিয়েই (াস্ত থাকতে পারি না। তাই ভবিষ্যতের জন্য insured হওয়া প্রয়োজন। এই ভবিষ্যৎ চিন্তা ধীরে জীবনের পরপার পর্যন্ত ছেয়ে যেতে বসেছে—ও দেশেও।

আশার সোনার প্রদীপ নিয়ে আমাদের চলতে হবে। বর্তমানই আমাদের কাছে প্রধান। ভবিষ্যতের ভয়ে মুহ্যমান হলে চলবে না। আবার ভবিষ্যতের কথা একেবারে ছেড়ে দিলেও হবে না। (ুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ করে আমাদের যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকবে হবে। গীতার ভগবানের বাণী মূর্ত করতে হবে,—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে
(ুদ্র হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বে(াত্তিষ্ঠ পরন্তপ।

তার সঙ্গে মহাবীর অর্জুনের মতও বলি—''প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।'' ❑

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রামানুজ গোস্বামী

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভক্তিযোগ বিষয়ক এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় এইটি। এতে আমরা পুনরায় নারদীয় ভক্তিসূত্র অবলম্বনে আলোচনা শুরু করছি। এতে স্পষ্ট ভাবেই বলা হয়েছে যে, অন্যান্য পথের তুলনায় ভক্তিযোগের পথই হল উৎকৃষ্ট।

"সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোহপ্যধিকতরা।।"২৫।।

অর্থাৎ—"কর্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গের চেয়েও ভক্তির পথ শ্রেষ্ঠ।"

কিন্তু, এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি? এর উত্তর দেওয়া হচ্ছে পরবর্তী সূত্রে—

"ফলরূপত্বাৎ"।।২৬।।

অর্থাৎ—"ভক্তি স্বয়ং ফলরূপা বলেই অন্য মার্গ থেকে তার শ্রেষ্ঠত্ব।"

ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই কারণ, ভক্তি একই সঙ্গে সাধককে সাধনার পথ বলে দেয় আবার চূড়ান্ত সিদ্ধিও প্রদান করে থাকে। এই বিষয়ে স্বামী ভূতেষানন্দজী বলেছেন যে, "ভক্তি কেবলমাত্র উপায় নয় উপেয়ও। ভক্তি একই সঙ্গে সাধন ও সিদ্ধি। প্রবর্তকরূপে ভক্তি অনুশীলন হচ্ছে সাধনপন্থা, এটি তখন উপায়। কিন্তু পথের শেষে আমরা যে লক্ষ্যে উপনীত হই সে-ও ভক্তি। তখন তা সাধ্য বা উপেয়।..... ভক্তি স্বয়ং সাধ্য এবং তা আমাদের হৃদয়ে নিত্য বর্তমান। তাই কোন প্রয়াসের দ্বারা তাকে সাধিত করতে হয় না। সাধনার দ্বারা পথের বিঘ্নগুলি অপসারিত করে তাকে প্রকাশিত করে দিতে হয় মাত্র।"

এখানেই অন্যান্য পথ বা যোগের সঙ্গে তুলনায় ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব তথা সার্থকতা অনুভব করা যায়। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কথা আলোচনা করব। বেদ-বেদান্ত তথা সমস্ত উপনিষদের সার নিহিত আছে গীতার মধ্যে। গীতা হল স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী। তাই গীতা পাঠ করলেই সমস্ত বেদ ও উপনিষদের বক্তব্য প্রসঙ্গে জানা যায়। এই বিষয়ে তাই বলা হয়েছে যে—

"সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।।"

অর্থাৎ—"এই গীতোপনিষদ্ ভগবদ্গীতা সমস্ত উপনিষদের সারাৎসার এবং তা ঠিক একটা গাভীর মতো, এবং রাখাল বালকরূপে প্রসিদ্ধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই এই গাভীকে দোহন করেছেন। অর্জুন যেন গো-বৎসের মতো এবং জ্ঞানীগুণী ও শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবদ্গীতার সেই অমৃতময় দুগ্ধ পান করছেন।"

গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নানা প্রকার যোগ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেছেন। ভক্তিযোগও এই সকল পথের মধ্যে অন্যতম। এবারে আমরা এই বিষয়েই আলোচনা করব। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন যে—

"ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ।।"

(গী ১২।২)

অর্থাৎ—"যিনি আমার সবিশেষ রূপে তার মনকে নিবিষ্ট করেন, অপ্রাকৃত ভক্তি সহকারে নিরন্তর আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।"

স্পষ্টতঃই এটা বোঝা যায় যে, এই শ্লোকে শ্রীভগবান ভক্তিযোগের বা ভক্তিপথের শ্রেষ্ঠত্বের কথাই বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে—

"যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।।"

(গী. ১২।৬)

"তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্।।"

(গী. ১২।৭)

অর্থাৎ—"হে পার্থ, যারা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে, মৎপরায়ণ হয়ে অনন্য ভক্তিযোগের দ্বারা আমার উপাসনা ও ধ্যান করেন, সেই সমস্ত ভক্তদের আমি মৃত্যুময় সংসার সাগর থেকে অচিরেই উদ্ধার করি।"

এককথায় ভবসাগর থেকে পরিত্রাণের সহজতম বা সরলতম পথই হল ভক্তিযোগ। এতে অন্যান্য নানাবিধ সাধনের মতো কষ্ট স্বীকারও করতে হয় না। ভক্তির পথ তাই একেবারেই সুগম। শ্রীভগবান নিজেই তাঁর ভক্তকে

ত্রাণ করেন, উদ্ধার করেন। অন্যান্য যে সকল পথ বা সাধন-পদ্ধতি রয়েছে, সেগুলির দ্বারাও ভগবান লাভ করা যেতে পারে—কিন্তু, সেই সকল পথ যেমন কঠিন, তেমনই কষ্টসাধ্য। তাই সকলের পক্ষে বিশেষতঃ সাধারণ মানুষের পক্ষে এই সকল কষ্টসাধ্য পথ অবলম্বনে সাধনা করা একান্তই দুঃসাধ্য। অন্যদিকে, ভক্তিযোগ অত্যন্ত সহজ ও সরল এক পন্থা। এই পথে অত্যন্ত দুরূহ কষ্টস্বীকার করবারও কোনই প্রয়োজন নেই। তাই এই সমস্যা দ্বারা জর্জরিত কলিযুগে ভক্তিযোগই ঈশ্বর লাভের সরল পথ যা সকলেই অনুসরণ করে চলতে পারে।

এই ভক্তিযোগ অনুশীলনের দ্বারা কিভাবে ভগবানকে লাভ করা যেতে পারে সেই বিষয়েও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ প্রদান করেছেন। এই ব্যাপারে ভগবান কয়েকটি উপায়ের কথা বলেছেন। এখন আমরা সেই বিষয়েই আলোচনা করব।

এক্ষেত্রে প্রথম উপায়টি হল, শ্রীভগবানের প্রতি মন বা চিত্তকে একেবারেই সমাহিত করা। নিঃসন্দেহেই এটি অত্যন্ত উচ্চ মানের অবস্থা। একে সমাধি অবস্থাও বলা যেতে পারে। কিন্তু, এই অবস্থা তো সকলে লাভ করতে পারে না। তাই ভগবান এক্ষেত্রে দ্বিতীয় উপায়টির কথা বললেন। এই উপায়টি হল অভ্যাসযোগ। এতে মনকে ধীরে ধীরে অভ্যাস সহযোগে শ্রীভগবানের প্রতি নিবিষ্ট করে তোলা যায়। ঐকান্তিক ইচ্ছা ও অধ্যবসায় সহযোগে অবশ্যই এটি সম্ভব হতে পারে। একান্ত ভাবে ভক্তিযোগ অনুশীলন করে যেতে পারলেই তা সম্ভব হয়।

কিন্তু, যদি কেউ এইভাবে অভ্যাস করতেও অসমর্থ হয়, সেক্ষেত্রে কি হবে? এই প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন তৃতীয় উপায়টির কথা। এই উপায়টি হল কর্ম করে যাওয়া; অর্থাৎ ভগবানের প্রীতি বা সন্তোষকারী কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া। এইভাবে কর্ম করে যাওয়ার দ্বারা এমনকি সিদ্ধি লাভ করাও সম্ভব। এতেও যদি কেউ সমর্থ না হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে কি অন্য কোন উপায় আছে? উত্তরে বলা যায় যে, নিশ্চয়ই আছে। ভগবান এই বিষয়ে চতুর্থ উপায়টির কথা বলেছেন। এই উপায়টি হল সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগ করা; অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রতি সকল কর্মফল সমর্পণ করে মুক্ত হয়ে যাওয়া। এতেও যদি কেউ অসমর্থ হয়, তবে রয়েছে পঞ্চম উপায়। তা হল জ্ঞানের চর্চা বা জ্ঞানাভ্যাস। কারণ, এই জ্ঞানচর্চাই ধীরে ধীরে ধ্যান ও কর্মফল ত্যাগ ইত্যাদি স্তরে সাধককে নিয়ে যায়।

এতক্ষণ আমরা নানা ভাবে গীতায় বর্ণিত বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করলাম। কিন্তু, যে ব্যক্তি ভগবানের একনিষ্ঠ ভক্ত, সেই রকম ব্যক্তিকে চেনা সম্ভব হবে কেমন করে বা কি উপায়? তাছাড়া এই রকম ভক্তদের বৈশিষ্ট্যই বা কি? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে এর উত্তরও দিয়েছেন। এখন আমরা সেই বিষয়েই আলোচনা করব। এই বিষয়ে আমরা ভক্তিযোগ বিষয়ক অধ্যায়ের শেষ কয়েকটি শ্লোক উল্লেখ করব। শ্রীভগবান বলেছেন যে—

"অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।।"

(গী. ১২।১৩)

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।।"

(গী. ১২।১৪)

অর্থাৎ---"যিনি সমস্ত জীবের প্রতি দ্বেষশূন্য, বন্ধুভাবাপন্ন, দয়ালু, মমত্ববুদ্ধিশূন্য, নিরহঙ্কারী, সুখ ও দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, সর্বদা সন্তুষ্ট, সর্বদা ভক্তিযোগে যুক্ত, সংযত স্বভাব, তত্ত্ববিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয় এবং যার মন ও বুদ্ধি সর্বদা আমাতে অর্পিত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।"

—এই প্রকারের একনিষ্ঠ ভক্তেরা যেহেতু সদা সর্বদাই একমাত্র শ্রীভগবানের আরাধনাতেই রত থাকেন, তাই উদ্বেগ বা চিন্তা, ভয়, হতাশা, সুখ, আনন্দ ইত্যাদি কোন ভাবই সেই ভক্তকে বিচলিত করতে পারে না। এই সকল ভক্ত একমাত্র স্বয়ং ভগবানকেই জীবনের সর্বস্ব জ্ঞান করে থাকেন আর তাই অপর কিছুরই প্রত্যাশা বা কামনা সেই ভক্তদের মনে ঠাঁই পায় না। স্বভাবতঃই এই সকল ভক্ত একেবারেই নিষ্কাম হয়ে থাকেন। শুধু তাই নয়, এই সব ভক্তেরা যেহেতু কামনা- বাসনার অধীনে থাকেন না, তাই প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি বোধই এই সকল ভক্তের কাছে শূন্য বা অর্থহীন হয়ে যায়। আবার অন্যদিকে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্তের কাছে পার্থিব জীবনের সুখ-দুঃখ,

মান-অপমান, নিন্দা-স্তুতি এইসবের কোনও মূল্যই নেই।

এখন আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভক্তিযোগ নামক অধ্যায়ের সর্বশেষ শ্লোকটি উল্লেখ করব। এতে শ্রীভগবান বলেছেন—

''যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়া।।''
(গী. ১২।২০)

অর্থাৎ—''আমার প্রতি শ্রদ্ধা সহকারে যারা আমার প্রদর্শিত ধর্মামৃতের পর্যুপাসনা করেন, তারাই আমার ভক্ত, তাই তারা আমার অত্যন্ত প্রিয়।''

এর অর্থ এটাই যে, শ্রীভগবান ভক্তিযোগ বিষয়ক এই যে উপদেশরূপ অমৃত আমাদের দিয়েছেন, সেই পথেই আমাদের শ্রীভগবানের উপাসনা করা কর্তব্য। এই ভাবে ভক্তিযোগের পথে শ্রীভগবানের সাধনা করলে আমরা শ্রীভগবানের প্রিয় ভক্ত হতে পারব এবং এই ভাবেই আমরা আমাদের জীবনকে সফল ও ধন্য করে তুলতে পারব। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভক্তিযোগ বিষয়ে শ্রীভগবান নানা উপায়ের কথা বলেছেন। আমাদের কর্তব্য হল নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে সেই সব পথের অনুসরণ করা। ভক্তির পথ অন্যান্য সকল পথ অপেক্ষা সরল বলেই এই যুগে তা অবশ্যই পালনীয়। জীবনকে এই ছন্দে বেঁধে নিতে পারলেই আমরা ভগবানের প্রিয় হতে পারব এবং সকল দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে মুক্ত হতে পারব। তাই ভগবানের প্রদর্শিত এই পথের প্রতি কখনই সন্দেহ প্রকাশ করা উচিত নয়। কারণ এর ফলে শ্রীভগবানের প্রতিই সন্দেহ করা হয়। তাই অন্তরে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রেখে দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের ভক্তিমার্গে অগ্রসর হতে হবে। এর ফলেই আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হব। এই মানবজীবন বড়ই দুর্লভ। তাই এই মনুষ্যজন্মকে যথার্থ রূপে কাজে লাগাতে হবে আমাদের। এই কাজে শ্রীভগবানের এই উপদেশই হবে আমাদের পথপ্রদর্শক।

এবারে আমরা পুনরায় নারদীয় ভক্তিসূত্র প্রসঙ্গে আলোচনা করব। এতে ভক্তিলাভ কিরূপে হতে পারে, সেই বিষয়ে কি বলা হয়েছে, তা নিয়েই এবারে আমরা আলোচনা করব। আগেই বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরে অপরিসীম প্রেমেরই অপর নাম হল ভক্তি। জাগতিক বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পার্থিব ভোগ-বাসনা ত্যাগ করতে না পারলে এই ভক্তি লাভ করা যায় না। ঈশ্বরের স্তব-স্তুতি ও নাম-গানের (সঙ্গীত) দ্বারাও ভগবানের প্রতি ভক্তিলাভ করা যায়। এছাড়াও জপ-ধ্যানাদি নানা প্রকার সাধনা ও তপস্যার অনুশীলনের দ্বারাও ভক্তিলাভ সম্ভব।

নারদীয় ভক্তিসূত্র আমাদের আরোও বলে যে, সমস্ত রকম অসৎ সঙ্গ সর্বতোভাবেই বর্জনীয়। তার পরিবর্তে সাধুসঙ্গ বা সজ্জন ব্যক্তির সঙ্গ বা সম্ভব হলে কোন মহাপুরুষের সঙ্গ করাই কর্তব্য। কারণ, এই সকল সঙ্গের গুণে অতি শীঘ্রই ভক্তিলাভ করা যায়। মনে রাখা দরকার যে, অসৎ ব্যক্তির সঙ্গ সাধকের মনকে বিক্ষিপ্ত করে, ষড়রিপুর দাস করে তোলে। সেই সাধকের পক্ষে তখন ভক্তিলাভ করা তো দূরের কথা, সাধনা করাই হয়ে ওঠে দুষ্কর। এই রকম ক্ষেত্রে তো সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের থেকে ক্রমশঃ দূরে, আরোও দূরে চলে যায়। এই কারণেই দরকার হল ভবরোগের ঔষধস্বরূপ সাধুসঙ্গ। কারণ এই সাধুসঙ্গের গুণ এমনই যে, তা অন্তরের সকল মলিনতাকে শীঘ্রই একেবারে দূর করে দিতে পারে।

এক্ষেত্রে একটি কথা কিন্তু অতি অবশ্যই মনে রাখতে হবে। এই যে সাধুসঙ্গের কথা এতক্ষণ বলা হল, তা কিন্তু লাভ হতে পারে একমাত্র ঈশ্বরের কৃপাতেই। প্রসঙ্গতঃ নারদীয় ভক্তিসূত্রের কথা উল্লেখ করা হল—

''লভ্যতেহপি তৎকৃপয়ৈব'' ।।৪০।।

অর্থাৎ—''আবার ঈশ্বরের কৃপা থাকলেই সাধুসঙ্গ লাভ হয়।''

আবার পরবর্তী সূত্রেই বলা হয়েছে যে—

''তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ।।'' ৪১।।

অর্থাৎ ''ভগবান ও তাঁর ভক্তের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই বলেই একের অনুগ্রহেই অপরের অনুগ্রহ পাওয়া যায়।''

—অতএব আমরা এটুকু বুঝতেই পারলাম যে, যদি আমরা যথার্থ ভক্ত হতে চাই বা ভক্তিলাভ করতে চাই, তবে অবশ্যই আমাদের ভগবানের কাছে একান্ত ভাবেই

প্রার্থনা করতে হবে। ঈশ্বরের কৃপা হলে নিশ্চয়ই আমরা মহাপুরুষ বা সদ্‌গুরু বা সিদ্ধপুরুষের সান্নিধ্য লাভ করতে সমর্থ হব। আমরা যদি পৃথিবীর ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত ও সাধকদের জীবন পর্যালোচনা করি, তবে আমরা এটাই দেখব যে, সেই সকল সাধকেরা উপযুক্ত সিদ্ধ-মহাত্মা বা সদ্‌গুরুর দর্শন লাভের জন্য কতটা ব্যাকুল ছিলেন এবং ঈশ্বরের কাছে এই বিষয়ে কত ভাবে প্রার্থনা করেছেন। এর ফলে ঈশ্বরের কৃপায় সদ্‌গুরুর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ও সাধনার দ্বারা এই সকল সাধক সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাই একথা বলাই বাহুল্য যে, একদিকে আমাদের ভগবানের কাছে উপযুক্ত মহাপুরুষের সঙ্গ লাভের জন্য প্রার্থনা করে যেতে হবে; আবার অন্যদিকে নিরন্তর সাধুসঙ্গও করে যেতে হবে। এর ফলেই আমরা ভক্তিমার্গে ক্রমশঃ অগ্রসর হতে পারব। এর জন্য অবশ্য আমাদের পার্থিব ভোগাসক্তি ক্রমশঃ ত্যাগ করতে হবে। নির্জনে বাস, অবিরাম ঈশ্বরকথার শ্রবণ-মনন, জপ-ধ্যান করে চলা ইত্যাদি নানা ভাবে মনকে ঈশ্বরাভিমুখী করে তুলতে হবে। এই প্রকার যে মন, তাতে খুব সহজেই ভক্তিলাভ করা যায়। অন্যদিকে নানারকম জাগতিক বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকলে, সমস্ত সাধনাই ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই মন থেকে সমস্ত রকম বিষয়-ভাবনা একেবারে দূর করে ফেলতে হবে। তবেই মিলবে ভক্তিপথের সন্ধান। একথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, ভক্তিমার্গ বা ভক্তিযোগ অন্যান্য সাধন-প্রণালী অপেক্ষা অত্যন্ত সহজ ও সরল। তাছাড়া এই যুগের পক্ষে এই পথ বেশ উপযোগী। এই ভক্তিযোগে সিদ্ধিলাভ কেন এত সহজ, এই বিষয়ে নারদীয় ভক্তিসূত্রে বলা হয়েছে যে—

"প্রমাণান্তরস্য অনপেক্ষত্বাৎ স্বয়ং প্রমাণত্বাৎ চ"।। ৫৯।।

অর্থাৎ—"ভক্তির আর অন্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। ভক্তি নিজেই প্রমাণ স্বরূপ।"

আবার, পরবর্তী সূত্রেই বলা হয়েছে যে—

"শান্তিরূপাৎ পরমানন্দরূপাচ্চ"।।৬০।।

অর্থাৎ—"ভক্তির পথ শান্তিস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ বলে তার সাধন অন্যান্য সাধন থেকে সহজ।"

—এর বিস্তারিত আলোচনা করার কোনও দরকারই হয় না। কারণ, এটা তো আমরা সকলেই অল্প বিস্তর বুঝতে পারি যে, ভক্তি বলা ভালো ভগবানের প্রতি ভক্তি আমাদের মনে এক অপার্থিব ও ঐশ্বরিক আনন্দের সঞ্চার করে থাকে। এই আনন্দ যদি কিঞ্চিৎমাত্রও আমাদের চিত্তে সঞ্চারিত হয়, তাহলেই আমরা এক ঐশ্বরিক শান্তির সন্ধান পাব। অতঃপর আমরা কখনই আর জাগতিক বা পার্থিব বিষয়গুলির প্রতি আকৃষ্ট হতেই পারব না। আসলে ভক্তিযোগ তথা ভক্তিমার্গটি শুরু থেকেই শান্তি দ্বারা পরিপূর্ণ। তাই এই পথে সাধনা শুরু করা মাত্রই সাধক নিজের চিত্তে সচ্চিদানন্দ ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত এক অনাবিল আনন্দের অনুভূতি উপলব্ধি করে। এই কারণেই ভক্তিযোগ অপর সাধনপথগুলি থেকে সর্বাপেক্ষা সহজ। যে কোনও স্তরের ব্যক্তি, তা তিনি বিদ্বান হোন বা মূর্খ সকলেই এই পথের অধিকারী হতে পারেন। আসলে, ভক্তিপথে চলবার বা ভক্ত হবার জন্য ধন, জন, জ্ঞান, বিচার শাস্ত্রাদি নানাবিধ কর্ম করা বা না করা, বৃত্তিগত বা বর্ণগত প্রভেদ ইত্যাদি কোনও কিছুরই কোনই গুরুত্ব নেই। যে কথা বহুবার আগেই বলা হয়েছে যে, ভক্ত বা বলা ভালো যথার্থ ভক্ত কেবল সেই ব্যক্তিকেই বলা যেতে পারে যে ব্যক্তি বা যে সাধকের কাছে প্রেম বা ভালবাসার জন কেবলমাত্র একজনই—তিনি ঈশ্বর। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে এইরূপে ভালবাসতে পারেন, তিনিই ভক্ত। জগতের ইতিহাসে এইরূপ বহু ব্যক্তির কথা আছে, যে সকল ব্যক্তিগণ নানা রকম পেশা তথা বৃত্তির দ্বারা জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু, এই সকল ব্যক্তিত্ব ইতিহাসে ভক্ত ও সিদ্ধপুরুষ রূপে পরিচিত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, অন্তরের ভক্তি আর ঈশ্বরের প্রতি অপরিসীম প্রেমই এই সকল সাধককে সিদ্ধসাধক রূপে প্রসিদ্ধ করে তুলেছে। তাই, ভক্তিযোগে সিদ্ধ হবার এক ও একমাত্র একটি শর্তই রয়েছে। আর তা হল সম্পূর্ণ নিঃশর্ত আর অসীম প্রেম সহযোগে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ। ঈশ্বর ভক্তের কাছে এইটুকুই চান। তাই আমাদের ভক্তিপথে সিদ্ধিলাভ করতে হলে প্রয়োজন হল ঈশ্বরকে ভালবাসা। এই ভালবাসা যত গভীর হবে, আমরা ততই এগিয়ে যাব ভগবানের দিকে। (ক্রমশঃ)

বাংলা নববর্ষ বরণ ঃ রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি

নিতাই নাগ

রবীন্দ্রনাথকে বলা হয় বিশ্বকবি—কবিগুরু—ঋষি কবি—মরমীয়া সাধক কবি। তাঁর ধর্মভাবনা—আধ্যাত্মিকতা—সংসারের কোলাহল থেকে নিভৃত অন্তরলোকে সাধনা—জ্যোতির্লোকে অন্তরের অনুভূতি তাঁকে এরূপে নানা আখ্যায় ভূষিত করেছে। তিনি স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে অবস্থিত থেকে তার ঊর্ধ্বে চিন্ময় জগতের প্রতি আস্পৃহা অভিব্যক্ত করেছেন তাঁর নানা রচনায়। তিনি দেশের মধ্যে থেকে দেশাতীত মহাবিশ্ব লোকের, কালের মধ্যে থেকে কালাতীত মহাকালের চিরসত্যের জন্য ব্যক্তির আধারে থেকে নৈর্ব্যক্তিক সত্তার নিগূঢ় মর্মবাণী প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছেন সারা জীবন ধরে। রবীন্দ্র জীবনীতে শান্তিনিকেতনে নববর্ষ বরণের কথা জানা যায়। নববর্ষের প্রথম দিনে পয়লা বৈশাখ তারিখে তাঁর ভাব-ভাবনা, চিন্তা-চেতনা কবি ব্যক্ত করেছেন তাঁর কবিতায়-গানে ও ভাষণে। বিচিত্রের দূত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বাস্তিবাদী কবি। তাই সমস্তের মধ্যে সহজে সঞ্চরণ করে সমগ্রের ভিতরথেকে আত্মার সত্যের স্পর্শ লাভ করে জীবন সার্থক করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সেই অভীপ্সার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর দৃষ্টিতে, তাঁর সৃষ্টিতে।

১৩০৮ বঙ্গাব্দের মাঝামাঝি সময়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের আশ্রমে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৩০৯ সালে নববর্ষে ১লা বৈশাখ কবিগুরু ব্রহ্ম উপাসনার মন্দিরে ভাষণ দেন। ভাষণে ভারতবর্ষের তপোবনের ঋষিদের আদর্শ প্রকাশ করে বলেন—"শান্তিনিকেতনের আশ্রমে নির্জন প্রকৃতির মধ্যে স্তব্ধ হইয়া বসিলে, অন্তরের মধ্যে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে হওয়াটাই জগতের চরম আদর্শ করাটা নহে।" এ যেন ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সত্যের শাশ্বত কথা—'Being and Becoming'। এই ভাবের অনুষঙ্গে নববর্ষের গানে—কবিতায় ঋষি কবি উদাত্তকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন ঋষিদের আদর্শ অঙ্গীকারের কথা—

"যে জীবন ছিল তব তপোবনে
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে
মুক্তদীপ্ত সে মহাজীবনে,
চিত্ত ভরিয়া লব।
মৃত্যুবরণ শঙ্কা হরণ
দাও হে মন্ত্র তব।"

—রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড,পৃঃ ৩৪

১৩০৯ সালে নববর্ষের সুপ্রভাতে তিনি বললেন—"যে অক্ষয় পুরুষকে আশ্রয় করিয়া—অহোরাত্রণ্যের্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সম্বৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি—দিন এবং রাত্রি, পক্ষ এবং মাস, ঋতু এবং সংবৎসর বিধৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, তিনি অদ্য নববর্ষের প্রথম প্রাতঃ সূর্যকিরণে আমাদিগকে স্পর্শ করিলেন। এই স্পর্শের দ্বারা তিনি তাঁহার জ্যোতিলোকে তাঁহার আনন্দ লোকে আমাদিগকে আহ্বান প্রেরণ করিলেন।....আজিকার নববর্ষ দিনে ইহাই আমাদের বিশেষ প্রার্থনা। সত্য, আলোক ও অমৃতের জন্য আমরা করপুট করিয়া দাঁড়াইয়াছি। বলিতেছি—আবীরাবীর্ম এধি। হে স্বপ্রকাশ, তুমি আমাদের নিকট প্রকাশিত হও।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪খণ্ড, পৃঃ ৬০৯)

১৩১৫ সাল থেকে সাধক কবি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ভাষণমালা তথা 'উপদেশ মালা' দিতে শুরু করেন। এই ভাষণমালা কবির ধর্মচেতনা—ঈশ্বরচেতনা ও আধ্যাত্মিকতার আলোকে দীপ্ত। গীতাঞ্জলি কাব্যের ভাবধারা এখানে সুপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। ১৩১৭ সালে নববর্ষের দিনে ভাষণমালার সুরটি চিরনবীনতায় প্রাণবন্ত উজ্জ্বল—".... বিশ্ব জগতে যে নববর্ষ চিরপ্রবহমান নদীর মতো অবিশ্রাম চলছে, একদিনের জন্যও যে নববর্ষের নবীনত্ব হ্রাস পায় না এবং সেইজন্যই প্রকৃতির মধ্যে দিন বলে কোন একটা বিশেষ দিন নেই, সেই নববর্ষকে মানুষ সহজে গ্রহণে করতে পারে না; তাকে চিন্তা করে গ্রহণ করতে হয়; বিশ্বের চিরনবীনতাকে একটি বিশেষ দিনে বিশেষ করে চিহ্নিত করে তবে তাকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতে হয়।" (রবীন্দ্রচনাবলী, ১৪খণ্ড, পৃ. ৮৬৮)

১৩৩৫ সনে নববর্ষের দিনে কবি আত্মজিজ্ঞাসার ভঙ্গীমায় বলেছেন—"আজ নববর্ষের প্রথম দিনে যখন নিজেকে একটি প্রশ্ন করি, তুমি কী করতে এসেছ অসীম দেশ ও কালের এক প্রান্তে? তার উত্তরে মন বলে, আর কিছু নয়, জীবনে এই কথাটি প্রকাশ করতে এসেছি যে,

দেখা হয়েছে। এই উত্তরটি আমার সমস্ত কর্মের মধ্যে নিহিত সমস্ত বাধার মধ্যে প্রচ্ছন্ন। ক্ষণে ক্ষণে শুভ মুহূর্তে উদ্ভাসিত চৈতন্যের দীপ্তিতে—এই উত্তরটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সকল দেখার অন্তরে সত্যকে দেখতে পেলুম।"

(রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪খণ্ড, পৃ. ৯৩৮)

শান্তিনিকেতনে এক সময়ে বর্ষশেষ ও নববর্ষ উৎসব পর পর দুদিন ধরে পালিত হত। ১৩৩২ সালে চৈত্র সংক্রান্তি দিনে বর্ষশেষ উৎসবের পর ১৩৩৩ সালে ১লা বৈশাখ নববর্ষ উদ্‌যাপনের উল্লেখ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ এই ১লা বৈশাখে চারখানি গান রচনা করেন। এই গানগুলি হল—

(১) হে চির নূতন, আজি হে দিনের প্রথম গানে
জীবন আমার উঠুক বিকাশি তোমার পানে.....

(২) আপনারে দিয়ে রচিলিরে কি এ আপনারই আবরণ,
খুলে দেখ দ্বার অন্তরে তোর আনন্দ নিকেতন

(৩) বাঁধন ছেঁড়ার সাধন হবে, ছেড়ে যাব তীর মাভৈ
রবে।

(৪) তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে/খুঁজিতে আমার
আপনারে...

কবিগুরুর সব গানের রচনার তারিখ পাওয়া যায় নি। আবার সব বছরে নববর্ষের উৎসবের উল্লেখ নেই কবির জন্মদিন গ্রীষ্মাবকাশের মধ্যে পড়ে বলে নববর্ষের দিনেই কবির জন্মোৎসব উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৩৪৩ সালে শান্তিনিকেতন ব্রাহ্ম মন্দিরে নববর্ষের দিনটিতে কবির চিত্ত চিরদিন যেভাবে উদ্বুদ্ধ হয় এ দিনও উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। তিনি এই দিনে সুন্দর বক্তৃতা দান করেন এবং কবিতাও লেখেন।

১৩৪৬ সালে ১লা বৈশাখ মৃত্যুর দু'বছর আগে কবি ব্রাহ্মমন্দিরে ভাষণে বলেছিলেন—"এই প্রশ্নটা আমার মনে কিছুদিন থেকে জাগছে, কী পেয়েছ জীবনে, সবচেয়ে কী বড়ো কথা তোমার অভিজ্ঞতায়। সবচেয়ে যা আমার চোখে পড়ে, সে হচ্ছে পরম বিস্ময়। আরম্ভ থেকে পদে পদে বিস্ময়ের অন্ত নেই। অন্য জীব জন্তুরা শুধু তাদের খাদ্যাহরণে তাদের বাঁধা জীবন যাত্রায় সন্তুষ্ট; তাদের তো বিস্ময় নেই।" (রবীন্দ্ররচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৬)

১৩৪৭ এর বৈশাখ শান্তিনিকেতনে কবির জন্মদিন পালনের সাথে সাথে নববর্ষের উৎসব পালিত হয়। কবি তাঁর জন্মোৎসবে তাঁর জীবনে কী চেয়েছিলেন এবং কী করেছেন সেই চিন্তন ভাষণে ব্যক্ত করেছেন।

১৩৪৮ সালে জীবিত কালের মধ্যে শেষ নববর্ষের উৎসব উপলক্ষে অসুস্থ কবির কাছে একটি গান চাওয়া হয়। সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুর কবিকে বলেন যে কবি যন্ত্রের জয়গান করেছেন, কিন্তু মানুষের জয়গান করেননি। কবি এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি কবিতা রচনা করেন, সেটাই হয় নববর্ষের গান। এই গানটি রবীন্দ্র অনুরাগীদের অতি পরিচিত অতি প্রিয় গান—

"ওই মহামানব আসে/দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে/মর্ত্য ধূলির ঘাসে ঘাসে....।"

১৩১৬ সালে ১লা বৈশাখ কবি শান্তিনিকেতনে একটি অসাধারণ কবিতা লিখেছিলেন যার সুর সমস্ত নববর্ষের দিনের সুরের স্পন্দনে স্পন্দিত, তা কালের বুকে থেকে কালাতীতকে স্পর্শ করার আকুলতায় আবেগ দীপ্ত—

"ওঁ শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্
শক্তির চাঞ্চল্য মাঝে বিশ্বে যিনি শান্ত যিনি স্থির
কর্ম তাপে মর্মদাহে তিনি দিন শান্তি-সুধা নীর।
সংসারের আবর্তনে বিরাজেন যে মঙ্গলময়
দুঃখে সুখে ক্ষতি লাভে তিনি দিন ভয়হীন জয়।
বিশ্বের বৈচিত্র্য মাঝে যিনি এক যিনি অদ্বিতীয়,
সর্ব জগতেরে তিনি নিশিদিন করে দিন প্রিয়,
যে মহা একের পানে বিশ্ব পদ্ম উঠিছে বিকাশি
তিনিই আমার পিতা, বল মন, বল পিতা নোহসি।"

(শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন থেকে সংগৃহীত)

———————————————

তথ্যসূত্র ঃ ১) রবীন্দ্রজীবনী—(৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)—প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯, ১৩৬৩ সাল
২) রবীন্দ্র রচনাবলী (৪র্থ ও ১৪শ খণ্ড) জন্মশত বার্ষিকী সংস্করণ, পঃ বঃ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত
৩) ওঁ শান্তম্ শিবম্ কবিতাটি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনের আর্কাইড বিভাগ থেকে প্রাপ্ত। এর পাঠভেদ আছে রবীন্দ্ররচনাবলী ১৫ খণ্ডে, পৃ. ৩০৫

মনীষী চোখে বিবেকানন্দ

ড. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

উনিশ শতকের বাঙ্‌লা। উপনিবেশিক শাসনে জর্জরিত। তবুও শিক্ষা-সংস্কৃতি আর মনীষী চর্চার ভারতকেন্দ্র বাঙ্‌লা। খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের অন্য ধর্ম সম্পর্কে বিদ্বেষ মনোভাবাপন্নতা, প্রাচীনপন্থীদের পিছনে ফিরে চলা, ইয়ং বেঙ্গল, ব্রাহ্ম-আন্দোলন, সাকার-নিরাকার দ্বন্দ্ব, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব সব মিলিয়ে এক সংশয় চালিত অবস্থায় কি করবে সাধারণ মানুষ, এমন বিপন্নতার কালে ধর্মদেশকে রক্ষা করতে উপস্থিত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণী কালী মন্দিরের পূজারী, তাঁর কথামৃতে আকৃষ্ট হয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকেরা ভিড় জমাতে লাগলেন এমনকি সেই সময়ের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরাও তাঁর সাক্ষাৎকারে নিজেদের ঋদ্ধ করলেন, উচ্চ কণ্ঠে স্বীকার করে নিলেন ঐ মহামানব সাধারণ ব্যক্তি নন। উত্তর কলকাতার সিমলার তরুণ নরেন্দ্র নাথ দত্তের সাক্ষাৎ ঘটলো শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে, এরপর ইতিহাস। নরেন্দ্রনাথ থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ভারত তথা বিশ্ব জুড়ে গুরুর কথা, দর্শন ভাবনা ছড়িয়ে দিতেই যেন তাঁর আবির্ভাব। শিকাগো ধর্মসভা থেকে যে কোন আলোচনা চক্রে সমবেত মানুষজন চমকিত হলেন আবিষ্কার করলেন নিজেকে, অনুভূত হলো ধর্মের প্রকৃত অর্থের, অমৃতের পুত্রেরা 'শিব জ্ঞানে জীব সেবার' মর্মোদ্ধার করতে পারলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের মানব লীলার সময় কাল মাত্র ৩৯ বছর। ওই স্বল্পকালেই তিনি যে দাগ রেখে গিয়েছিলেন তা আজও আমরা অনুভব করছি। তাঁর 'বাণী ও ভাবনা' বিনা আমাদের উদ্ধার নেই। স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে যে সকল মনীষী আলোচনা করেছেন, লিখেছেন তা থেকে কিছু উদ্ধার করতে পারলে জানা যাবে বিবেকানন্দ কে ছিলেন, কি তাঁর প্রভাব দেশ কাল জাতির উর্দ্ধে।

রবীন্দ্রনাথ, বিশ্ববিশ্রুত কবি-দার্শনিক-শিক্ষাবিদ্ প্রথম এশীয়বাসী নোবেল পুরস্কার প্রাপক। সাহিত্যের সব শাখাতেই যিনি স্বচ্ছন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের চেয়ে ২ বছর বয়সে বড় ছিলেন। তিনি বিবেকানন্দ সম্বন্ধে জানিয়ে ছিলেন—"যদি, তুমি ভারতকে জানতে চাও, বিবেকানন্দকে জানো। তাঁর মধ্যে সবকিছুই ইতিবাচক, নেতিবাচক কিছু নেই।" স্বামী বিবেকানন্দ সেই মনীষা যে ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে এবং পশ্চিমের সাধনা ভারতবর্ষকে দেওয়া ও নেওয়ার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বিবেকানন্দ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তিকে দেখেছিলেন দরিদ্রের মধ্য দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান। স্বামীজীর এই বাণী যে রবীন্দ্রনাথকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল তা আমরা বুঝতে পারি এই উক্তির মধ্য দিয়ে—

"একে বলি বাণী..... বিবেকানন্দের এই বাণী সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন বলেই কর্মের মধ্য দিয়ে, ত্যাগের মধ্য দিয়ে মুক্তির বিচিত্র পথে আমাদের যুবকদের প্রবৃত্ত করেছে।"

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক কর্মযোগী পুরুষ বিপ্লবী থেকে ঋষি শ্রী অরবিন্দ ঘোষ। স্বামী বিবেকানন্দকে দেখেছিলেন, বুঝেছিলেন শ্রী রামকৃষ্ণের কথায়। যীশুখ্রীষ্ট যেমন সেন্ট পলকে দেখে বুঝেছিলেন, সমস্ত ইউরোপ তার পদতলে। তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণও বুঝেছিলেন ভারতের জাতীয় আদর্শের বীজ বিবেকানন্দের মধ্যে নিহিত আছে। অরবিন্দের মতে —'বিবেকানন্দই আমাদের জীবন গঠনকর্তা। তিনিই ইহার প্রধান নেতা।'

অরবিন্দের কথায় রামকৃষ্ণ ছিলেন মানুষী আধারে প্রকট ভগবান। "আর বিবেকানন্দ—মহাদেবের নয়ননিঃসৃত এক দীপ্ত কটাক্ষ।"

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা পুরুষ জাতির জনক শিরোপায় ভূষিত 'মহাত্মা' মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী। বেলুড় মঠে এসে জানিয়েছিলেন বিবেকানন্দ রচনাবলী মনযোগ সহকারে পাঠ করে মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা হাজার গুণ বেড়ে গেছে। যুবকদের গান্ধীজীর আবেদন—"যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ বাস করেছেন এবং

শরীর ত্যাগ করেছেন সেই পুণ্যভূমির কিছু মাহাত্ম্য আত্মস্থ না করে তোমরা শূন্য হাতে ফিরে যেয়ো না।"

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সেনানী আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক 'দিল্লী চলো' মন্ত্রের উদ্গাতা নেতাজী বাঙালীর সবচেয়ে ভালো লাগার একজন যাকে বিবেকানন্দের 'মানসপুত্র' বলেও আখ্যা দেওয়া হয়, স্বয়ং সুভাষ বোস সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনে একবার গিয়েছিলেন যদিও মঠাধ্যক্ষ তাঁকে দেশের কাজেই নিজেকে মেলে ধরতে বলেন। ছাত্রাবস্থায় বিবেকানন্দের লেখা বই পড়ে জানতে পেরেছিলেন জীবনের মূল আদর্শকে। "চেহারায় এবং ব্যক্তিত্বে আমার কাছে বিবেকানন্দ ছিলেন আদর্শপুরুষ। তাঁর মধ্যে আমার মনের অসংখ্য জিজ্ঞাসার সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছিলাম। স্বামী বিবেকানন্দের পথই আমি বেছে নিলাম.....।"

সুভাষের মতে, স্বামী বিবেকানন্দই বর্তমান বাংলার স্রষ্টা—একথা বললে বোধ হয় ভুল করা হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ উভয়ের নিকট সুভাষ ছিলেন ঋণী। সুভাষের মতে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে এক যোগে স্বামীজীকে না দেখলে যথাযথভাবে বিচার করা যাবে না। সুভাষচন্দ্র বসু চরিত্র গঠনের জন্য "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য" অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাহিত্য কল্পনা করতে পারেন না।

বিশিষ্ট বাগ্মী মারাঠা তিলক ভারতের মুক্তি সংগ্রামের নায়ক বিবেকানন্দের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন —ভারতবর্ষের বাইরে বিভিন্ন দেশে হিন্দুধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠার এই সুকঠিন দায়িত্ব স্বামী বিবেকানন্দ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

বিশিষ্ট সাংবাদিক শিক্ষক ও বিবেকানন্দের সহপাঠী ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বিবেকানন্দকে মূল্যায়ন করেন—এই ভাবনায় ভাবিত হয়ে যখন তাঁর কাজের দিকে দৃষ্টিপাত করেন তখন ভাবেন। যে প্রকাণ্ড কাজ ফাঁদিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিবেকানন্দের মহত্বের ইয়ত্তা করা যায় না।'

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কাণ্ডারী বিপিনচন্দ্র পাল বিবেকানন্দের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন পরমহংসদেবের জীবনবেদ ও বাণী এ যুগের মানুষের বোঝবার উপযোগী ভাষায় ব্যাখ্যা ও প্রচারের ভার বিবেকানন্দের উপর ন্যস্ত হয়েছিল।

'রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপলব্ধির আলোকেই বিবেকানন্দকে বুঝতে হবে।'

বিবেকানন্দের বাণী আধুনিক মানবতার বাণী স্বদেশবাসীর কাছে বিবেকানন্দ আবেদন করেছিলেন মানুষ হওয়ার জন্য।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা সংগ্রামী অবশ্যই সুলেখক জওহরলাল নেহেরু স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—"স্বামী বিবেকানন্দ একদিকে যেমন অতীত ভারতের ভাবধারায় অভিস্নাত এবং প্রাচীন ভারতের গৌরবে গৌরবান্বিত অন্যদিকে তেমনি মানুষের জীবন সমস্যার বিষয়ে আধুনিক মনোভাবাপন্ন। প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের মধ্যে তিনি ছিলেন এক প্রকার মিলন সেতু।"

অনন্য সাধারণ পুরুষ। সম্ভ্রম উদ্রেককারী ব্যক্তিত্ব। সর্বদা মানসিক সমতা রক্ষা করতে সক্ষম। মর্যাদা সম্পন্ন। নিজের এবং নিজের জীবনব্রত সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয়। সক্রিয় জ্বলন্ত শক্তিতে তিনি ভরপুর। ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাবার এক সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা সবসময় তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল, হতাশ আদর্শ ভ্রষ্ট হিন্দু মানসে তিনি সঞ্চার করেছিলেন শক্তি। তাকে দান করেছিলেন আত্মবিশ্বাস এবং অতীত সম্পদের কিছুটা উত্তরাধিকার।

চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর সামলানো জাতীয়তাবাদীনেতা বাংলা ও বাঙালীর প্রতি একটা বিশেষ টান ছিল। তাঁর কথায় স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম ও ভারতবর্ষকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি না থাকলে আমরা ধর্ম হারাতাম, স্বাধীনতাও পেতাম না। "তিনিই ভারতীয় স্বাধীনতার জনক—আমাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার তিনি পিতা।"

গান্ধী ভাবাদর্শে বিশ্বাসী ভূদান আন্দোলনের নেতা বিনোবাভাবে স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করেছেন এই বলে যে, স্বামীজী আমাদের শক্তি সম্পর্কে যেমন সচেতন

করেছেন তেমনি দুর্বলতার দিকে অঙ্গুলি সংকেত করেছেন। 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দটি বিবেকানন্দের সৃষ্টি। শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও দেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বিবেকানন্দকে স্মরণ করেছেন দেশ-কালের সঙ্কটে। মূল্যবোধহীন, নৈতিক মানের অবনমন, পলায়নী মনোবৃত্তি ইত্যাদি সর্বত্রই যখন আমরা পশ্চাদমুখী তখন দরকার বিবেকস্মরণ কেননা— বিবেকানন্দ আমাদের যন্ত্রণার মধ্যে আশ্রয় দিয়েছেন, দুঃখের মধ্যে দিয়েছেন আশা, হতাশার মধ্যে সাহস। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বামীজীও তাঁর বাণীকে হৃদয়াঙ্গম করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একজন মহান সন্ন্যাসী ও নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক। ভারতের জাতীয় চেতনার 'জাগরণে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। আজও তাঁর অনেক প্রাণ ছোঁয়া আবেদন ভারতের জাতীয় চেতনার মর্মমূলে আলোড়ন তোলে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে দৈবীসত্তা রয়েছে—বেদান্তের এই শাশ্বত সত্য স্বামীজী ভারতীয়দের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর উপদেশ ও আদর্শ জাতীয় জীবন স্রোতে নতুন বেগ যুক্ত করেছিল, নতুন উদ্যম ও আশার সঞ্চার করেছিল এবং দেশসেবা ধর্মীয় সাধনার স্তরে উন্নীত হয়েছিল।

বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ---অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বিবেকানন্দ আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছেন এমন একজন মানুষ হিসেবে যাঁর হৃদয় মানব জাতির দুঃখ-কষ্টে গভীরভাবে আলোড়িত, বিশেষ করে ভারতের মানুষের জন্য—"বিবেকানন্দ একজন অবতার, দৈব অনুপ্রাণিত ও ঈশ্বর নির্দিষ্ট পথ-প্রদর্শক—শুধুমাত্র ভারতের জন্যে নয়, বর্তমান যুগের সমগ্র মানব জাতির জন্য।"

বিশিষ্ট রুশী কথা সাহিত্যিক লিও টলস্টয় বিবেকানন্দের 'রচনাবলী' পড়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন, সেই অনুভব ডায়েরীতে লিখেছেন। নানান সময়ে এ নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ্ বিপ্লবী জান মাসাবিকের সঙ্গে সাক্ষাৎপর্বে বলে ছিলেন 'বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক হলেন স্বামী বিবেকানন্দ।'

নোবেল জয়ী ফরাসী সাহিত্যিক দার্শনিক রোমাঁ রোলাঁর মতে বিবেকানন্দ ছিলেন মূর্তিমান শক্তি, কর্মই ছিল মানুষের কাছে তাঁর বাণী। বীঠোফেনের মতো তাঁর কাছেও সমস্ত সদ্গুণের মূলে ছিল কর্ম।...

তাঁর কথাগুলো ছিল সঙ্গীতের মতো; বীঠোফেনের মতো সেগুলোর বাক্যাংশের বিন্যাস, আর হ্যাণ্ডেলের কোরাসের মতো প্রাণ-মাতানো ছন্দ। তাঁর এইসব কথা ছড়িয়ে আছে ত্রিশবছর আগে লেখা বইগুলোর মধ্যে। কিন্তু তবুও যখনই আমি সেগুলো পড়ি, আমার সারা শরীর দিয়ে যেন চকিতে তড়িৎস্পর্শের মতো শিহরণ বয়ে যায়। তাহলে কথাগুলো যে সময় এই বীরের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল, সেই মুহূর্তে সেগুলো কী শিহরণ, কী উন্মাদনারই না সৃষ্টি করেছিল।

চীনা ঐতিহাসিক অধ্যাপক হুয়াং জিন চুয়ান এর ভাষায় বর্তমানে চীনে বিবেকানন্দ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও সমাজসেবী রূপে পরিচিত। তাঁর দার্শনিক ও সামাজিক চিন্তা এবং বীর্যদীপ্ত দেশপ্রেম কেবল ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকেই উদ্বুদ্ধ করেনি, পৃথিবীর অন্যান্য দেশকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল।

রুশী ভাষাতত্ত্ববিদ ই.পি চেলিশেভ দীর্ঘদিন ধরে বিবেকানন্দ চর্চা করছেন। তাঁর অনুভব সোভিয়েতের মানুষজন মনে করে স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী বস্তুত অভিন্ন; বিধ্বংসী পারমাণবিক যুদ্ধের গ্রাস থেকে বিপন্ন মানব সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে তাঁদের বাণী একান্তই অপরিহার্য। রাশিয়ার মানুষের বিশ্বাস একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণীই আতঙ্ক পীড়িত বিশ্বে শান্তি সমন্বয় ও পারস্পরিক বোঝাপড়ায় সক্ষম।

মনীষালোকে বিবেকানন্দ পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই বিবেকানন্দের প্রভাব সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে। এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী তাঁর গুরুর স্বপ্নকে সাকার করার গুরুদায়িত্ব নিয়ে সারা বিশ্বের মানুষকে শুনিয়েছিলেন যে কথাগুলো, দেখিয়েছিলেন যে পথ তা আজও ভীষণ প্রাসাঙ্গিক। নতুন ভারত নতুন বিশ্ব গড়ে তুলতে হলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ স্মরণ প্রাসঙ্গিক।

—০—

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য

শ্রী মৃগাঙ্ক ভূষণ নিয়োগী

ঈশ্বরপরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্।।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ৬টি ভূমিতে লীলা করিয়াছেন —গোকুল, বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস। ভগবানের কুরুক্ষেত্র লীলা ছাড়া আর সব লীলাই ভাগবতে বর্ণিত। কুরুক্ষেত্র লীলা মহাভারতে সবিস্তারে প্রকাশিত, তাই বেদব্যাস ভাগবতে ইহার পুনরাবৃত্তি করেন নাই। কুরুক্ষেত্র কর্মভূমি, মথুরা ও দ্বারকা ধর্মভূমি আর বৃন্দাবন রসভূমি।

কর্মভূমিতে কৃষ্ণের সৎ-স্বরূপ, ধর্মভূমিতে চিৎ-স্বরূপ আর রসভূমিতে আনন্দ স্বরূপের প্রকাশ। অর্থাৎ সমগ্র লীলায় ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বরূপ উন্মোচিত।

এই ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৈকুণ্ঠ স্বরূপ। ত্রেতাযুগে ভারতভূমিতেই মর্যাদা-পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র ও দ্বাপরযুগে সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে এই কথাই প্রমাণিত ও প্রকাশিত। নারায়ণ শব্দের অর্থ—নার শব্দের অর্থ জীবকুল, অয়ন শব্দের অর্থ আশ্রয় বুঝায়। জীবকুলের আশ্রয়স্থল পরমাত্মা।

দুধে টক বা অম্ল মিশাইলে দধি হয়। দুধ দধিতে রূপান্তরিত হয়। দুধ হইল দধির কারণ স্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে দুধ আর দধি একই বস্তু। তেমনি পরমাত্মা সংহার প্রয়োজনে গোবিন্দ হইতে শিবরূপ ধারণ করেন। শিব ও গোবিন্দ একই—পূর্ণ ব্রহ্ম।

আকাশ যেমন এক হইয়াও ঘটপটাদির জলে পৃথক পৃথক রূপে প্রতীয়মান হয়, তেমনি পরমেশ্বর আত্মারূপ এক এবং অদ্বিতীয় হইয়াও সর্ব-নীর-ঘটে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। অন্যভাবে বলা যায়, চন্দ্র কলা সমূহের হ্রাসবৃদ্ধি হয়, চন্দ্রে হয় না। চন্দ্র কলা সমূহের ক্ষয়কেই অমাবস্যা বলে। পরন্তু চন্দ্রের কোন বিকার নাই। ইহা প্রকৃতই দৃষ্টি বিভ্রম। চন্দ্রমা, ইহা সর্বদাই পূর্ণ ও পরিপূর্ণ।

বৈকুণ্ঠে বা গোলোকে লক্ষ্মী ও নারায়ণ চির মিলনে। ধরায় কিন্তু দেখা যায় প্রাপ্তিযোগে বিষম বিপুল প্রতিকূলতা বা প্রতিবন্ধকতা। উভয় উভয়কে চাহিলেন কিন্তু আদৌ সহজলভ্য হইল না। তাই দ্বারকালীলায় দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিনীকে পাণিপ্রার্থী সমবেত রাজন্যবর্গের সম্মুখে অপহরণ করিয়া এবং পথে ভ্রাতা রুক্মিকে প্রবল যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে লাভ করিলেন। হারাইয়া পাওয়া, যুদ্ধ করিয়া আদায় করা, অসীম উৎকণ্ঠায় অশ্রু বলে পাওয়া , সংগ্রামে প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করা—আমরা দেখিতে পাই। যুদ্ধ জয়ে আনন্দ। বিজয়লক্ষ্মীকে লাভ করিয়া মহানন্দ। স্বর্গধামের প্রাণপ্রিয়াকে ধরাধামে নূতন করিয়া পাইয়া পরমানন্দ লাভ। পরলোকে প্রেমের ভুবনে ইহাই ব্রহ্মানন্দ লাভ। এই বস্তু, এই লীলা বৈকুন্ঠে নাই।

কৃষ্ণের মধুরলীলা—বৃন্দাবনে, ব্রজধামে, ব্রজগোপীদের নিয়ে কৃষ্ণ যে মধুর লীলার আস্বাদন করিয়াছেন, সাধারণ অহংসর্বস্ব মানবের পক্ষে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। এই মহা প্রেমলীলা অপার্থিব ও অপ্রাকৃত। অসাধারণ এই প্রেমলীলা মানুষ সাধারণ ও পরিমিত বুদ্ধি দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করে, তাই বিভ্রান্ত হয়।

শ্রীকৃষ্ণের এই অনাসক্ত-কামগন্ধহীন-মদনদলন -মদনবিজয়লীলা দর্শন করিয়া স্বর্গের দেবদেবীরা মুগ্ধ হন, মোহিত হইয়া যান। শুকদেব বলিয়াছেন—ঈশ্বরের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে ইহা ধর্মের ব্যতিক্রম মনে হইলেও চোদ্দ পোয়া পেটসর্বস্ব মানবের পক্ষে ধারণাতীত। মনে রাখিতে হইবে, অগ্নি সর্বভুক হইয়াও কদাপি অপবিত্র হয় না।

ভক্ত আর ভগবানের মিলন চিরন্তন। ভক্ত সঙ্গ ছাড়া ভগবানের এক দণ্ডও চলে না। কীভাবে তাঁহাকে ডাকিলে, কিভাবে তাঁহার ভাবে ভাবিত হইলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে তাহা শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিতেছেন—

সর্বগুহ্যতম ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্।।
গীতা ১৮।৬৪

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে।।
গীতা ১৮।৬৫

আমাতে তোমার মন সঁপে দাও। আমার ভক্ত হও। আমাকে পূজা কর। আমায় প্রণাম কর। তুমি আমার প্রিয়। তোমাকে সত্য বলছি—আমাকে তুমি পাবে।

শ্রীমতী রাধারাণীর বরণ আর শ্রীকৃষ্ণের গড়ন লইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন শ্রীচৈতন্যদেব। তাই তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী।
বৃষভানু সুতোদেবী প্রণমামি হরিপ্রিয়ে।।

চৈতন্যদেব রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ। তিনি সেই লোকের প্রেম সম্পদ ধরাধামে আপামর জনগণের মধ্যে অকাতরে বিলাইয়া দিয়া গিয়াছেন। কলিযুগের যুগোপযোগী নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে ব্রজের প্রেমমাধুরী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তুলনা তিনিই।

শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যের বরতনু আশ্রয় করিয়া নবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হইয়া দ্বাপর যুগের রাধার প্রেমের যে ঋণ ছিল, তাহা কলিযুগে শোধ করিয়া যান।

তপ্ত কাঞ্চনের মত তাঁহার বর্ণ, মেঘের মত গম্ভীর তাঁহার কণ্ঠস্বর, আজানুলম্বিত বাহু, পদ্মের মত সুন্দর তাঁর চক্ষুদ্বয়, মুখখানি ঠিক শরতের চাঁদের মত।

চৈতন্যদেব স্বয়ং ত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াও দেখিলেন যে জগতে ত্যাগীর সংখ্যা বড়ই অল্প—অধিকাংশ মানুষই গার্হস্থ্যাশ্রমে বাস করে। সেইজন্য দুর্বল জীবকে অভয় দিবার ও সুগম পথ দেখাইবার জন্য পরবর্তীকালে তিনিই আদর্শ গার্হস্থ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠাকল্পে মনোযোগী হইয়াছিলেন।

তিনি তৎকালীন বঙ্গদেশের ভিক্ষু শ্রেষ্ঠ অবধূত প্রভু নিত্যানন্দকে নিভৃতে আপনার গূঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলেন—" প্রভুপাদ, গৃহস্থাশ্রম ধর্মের প্রতিষ্ঠাভূমি, অন্য তিন আশ্রমের অবলম্বন স্থান। সদ্‌গৃহস্থ না হইলে চরিত্রবান ধার্মিকপুত্র কন্যা না জন্মিলে, ধর্ম ও সমাজ কে রক্ষা করিবে? আপনাকে আদর্শ গৃহী হইয়া গৃহস্থাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আপনিই এ গুরুভার বহনে সক্ষম।"

কথায় আছে, মহাপুরুষের স্বভাব স্বতন্ত্র। দেখা যাইতেছে, মহাপ্রভু যৌবনে গৃহস্থ বিসর্জন দিয়া, আবার তিনিই এক প্রৌঢ় অবধূতকে গৃহী সাজাইলেন। আনন্দময় প্রভু নিত্যানন্দের আনন্দ সর্বত্রই। তাঁহার কাছে সংসার ও অরণ্য উভয়ই সমান।

বড়গাছিয়া নিবাসী বিশিষ্ট পণ্ডিত ভক্ত সূর্য্যাদাস সরখেলের ভক্তিমতী কন্যাদ্বয় শ্রীমতী বসুধা ও শ্রীমতী জাহ্নবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। সাধুভক্ত পাপীতাপীর আশ্রয়স্থল শ্রীপাট খড়দহে আদর্শ গৃহস্থাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং দেবীদ্বয় প্রভু নিত্যানন্দের অনুগামিনী হইয়া সহধর্মিণী নাম প্রকৃতই সার্থক করিলেন।

তাঁহার বংশধরগণ এখনও বর্তমান এবং খড়দহ আজ পবিত্র তীর্থস্থান রূপে গণ্য। প্রভু নিত্যানন্দ এবং আচার্য্য অদ্বৈতের বংশধরগণ এবং অন্যান্য গোস্বামীরা চৈতন্যদেবের প্রচারিত ভক্তি মার্গের সংরক্ষণ ও প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

জয় নিতাই। জয় শ্রীশ্রীনিতাই সুন্দর কী জয়।।

—০—

দেবব্রত ঘোষ

কাছে যেতে বড় ইচ্ছা করে
যে জন আছে প্রাণের পরে
ইশারায় পাই যে সাড়া
চকিতে দেন যে ধরা।
তারপরেতে নীরব সব
মলিন হলো যত উৎসব।
তবু আমি যাব না থেমে কভু
যতদিন না ধরা দেন প্রভু।
অনুরাগে আমি বড়ই বিভোর
কাটে না মোর ঘুমের ঘোর
তবু ইচ্ছা করে যেতে কাছে
যে জন আছে বুকের মাঝে।

—০—

প্রধান কথা বিশ্বাস। যেমন ভাব তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়। বিশ্বাস হয়ে গেলে আর ভয় নাই। —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

ব্রহ্মচারী সুনীল

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।।

—গীতা, ১৫।১৬

অর্থ ঃ এই জগতে পরিবর্তনশীল ও অপরিবর্তনীয় —এই দুই প্রকার পুরুষ আছে। পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত সবকিছুই বিনাশী বা ক্ষর। একমাত্র কূটস্থ যে আত্মা তাই অবিনাশী বা অক্ষর। সুতরাং শরীর বিনাশী এবং জীবাত্মা অবিনাশী।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে গড়ে উঠা বেদের মধ্যে দুটি বিদ্যার কথা বলা হয়েছে। একটি হলো—অপরা বিদ্যা এবং অপরটি পরাবিদ্যা। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ৪র্থ ও ৫ম শ্লোকে এই অপরা ও পরা প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে। এই ক্ষর ও অক্ষরকে গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত করা হয়েছে। জগৎ হলো ক্ষর এবং ব্রহ্ম হলো অক্ষর।

বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির লীলাবিলাসে মানুষ হলো—জীবজগতে শ্রেষ্ঠ জীব। প্রকৃতিকে জয় করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা এবং আত্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসা তাকে এই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী করেছে। আহার, নিদ্রা ও মৈথুন এই তিনটি বৃত্তি হলো জীবের সহজাত প্রকৃতি। শরীর রক্ষার জন্য জীব আহার করে। শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি দূর করতে জীব নিদ্রা যায়। মৈথুনের দ্বারা জীব আনন্দ উপভোগ করে এবং বংশ বিস্তার করে থাকে। শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ এর ব্যতিক্রম নয়। মানব জীবনের উত্তরণ ঘটাতে হলে এই তিনটি বৃত্তি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। পরাবিদ্যা এবং অপরাবিদ্যায় যথার্থ প্রয়োগের দ্বারা এই উত্তরণ সম্ভব। এই পরা এবং অপরাবিদ্যাকে সামনে রেখে চতুর্বর্গের বিকাশ ঘটেছে। এই চতুর্বর্গকে বলা হয়—পুরুষার্থ। এই চতুর্বর্গ হলো—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ধর্ম, অর্থ, কাম হলো—অপরাবিদ্যা এবং মোক্ষ হলো—পরাবিদ্যা। সুতরাং জীবনের উত্তরণের ধারাতে অপরাবিদ্যা ও পরাবিদ্যার ভূমিকা রয়েছে। অপরাবিদ্যার সাহায্যে জীবনের সুখ ও স্বাচ্ছন্দকে বৃদ্ধি করা যায়। পরাবিদ্যার সাহায্যে মানুষ লাভ করে—ঈশ্বর বা আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান।

পরা এবং অপরাবিদ্যার জন্য সাধনার প্রয়োজন। সাধনা হলো—নির্দিষ্ট পথে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কষ্ট সহ্য করা। অপরাবিদ্যার অনুশীলনে গড়ে উঠেছে বস্তুবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা। পরাবিদ্যার অনুশীলনে গড়ে উঠেছে দর্শন ও ব্রহ্মতত্ত্ব। অপরাবিদ্যার দ্বারা বিকশিত ভোগ্যবস্তুর জগতে মানব মন আবর্তিত হতে হতে যখন সে বৈরাগ্যের পথে অগ্রসর হয় তখন সে প্রবেশ করতে পারে পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার জগতে। বৈরাগ্য ছাড়া পরাবিদ্যার অধিকারী হওয়া যায় না। প্রবৃত্তিমার্গের সাহায্যে মানুষ সুখ-স্বাচ্ছন্দকে বাড়িয়ে তুলেছে। কিন্তু তার মনের মধ্যে থেকে গেছে এক অপূর্ণভাব। নিবৃত্তিমার্গের সাহায্যে মানুষ তার এই অপূর্ণ ভাবকে দূর করে পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়। প্রয়োজন সাধনা। এই সাধনাকে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—অভ্যাস যোগ। অভ্যাস ছাড়া কোন কিছুই আয়ত্ত্ব করা যায় না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—কালির ঘরে থাকলে কালি লাগে। দই বসাতে হলে—দুধের মধ্যে দই এর সাজা দিয়ে এক জায়গায় স্থির ভাবে রাখতে হয়। হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে একটা দিয়াশলাই কাঠি জ্বাললে মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকার চলে যায়। এই তিনটি কথার মধ্য দিয়ে মানব জীবনের উত্তরণ ঘটে। কালির ঘর বলতে বুঝায়—বিষয়ের জগৎ। মানুষের মন বাসনাযুক্ত হয়ে দশটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বস্তুজগতের বিষয়গুলো ভোগ করে। বিষয়রূপ কালি মনের মধ্যে দাগ ফেলে। এই কালির দাগকে মুছে দিতে হলে প্রয়োজন হয় সৎ গ্রন্থ পাঠ, জ্ঞানী জনের কথা শুনা ইত্যাদি। শাস্ত্রে এই কালির দাগকে বলেছে মনের মলদোষ। এরপর আছে মনের—বিক্ষেপদোষ। বিক্ষেপ মানে নড়াচড়া। এই দোষ দূর করতে হলে—প্রয়োজন জপ ও ধ্যানের। জপ-ধ্যানের মধ্যে দিয়ে মনের চাঞ্চল্যভাব দূর হয়। এরপর আছে আবরণ দোষ। এই আবরণ দোষ মানে অন্ধকার ঘর। এই আবরণ দোষ সাধনার সাহায্যে দূর করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে বলা হয়েছে— ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের স্পর্শে এই আবরণদোষ চলে যায়। উপনিষদীয় তত্ত্ব অন্য কথা বলে, উপনিষদীয় তত্ত্ব হলো জ্ঞানযোগের পথ। এই পথ বড়ই কঠিন।

কঠোপনিষদে বলা হয়েছে—

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।।
—কঠ-১।৩।১৪

অর্থ ঃ উঠ, জাগ, শ্রেষ্ঠকে লাভ করার জন্য শ্রেষ্ঠ আচার্যের কাছে গিয়ে এই শ্রেষ্ঠতত্ত্ব জান। মেধাবীগণ বলে থাকেন যে, তীক্ষ্ণ ক্ষুরের অগ্রভাগ যেমন দুর্গম—উক্ত পথও সেইরকম খুবই দুর্গম।

এখানে অবশ্য ঘুরে ফিরে সেই শ্রেষ্ঠ আচার্য তথা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কথা বলা হয়েছে। আসল কথা মনের শুদ্ধতা, ঈশ্বরলাভই বল আর ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভ বল— সবই মনের উপর নির্ভর করে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—"মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। বায়ু স্থির হলে সব স্থির"। বিদ্যাসাগরের সাথে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"সব কিছুই উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয়নি।" এই পরমসত্যটা কঠোপনিষদের একটা শ্লোকে বলা হয়েছে—

নায়মাত্মা প্রবচলেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য—
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।
—কঠ-১।২।২৩

অর্থ ঃ এই আত্মাকে বেদের বহু প্রকৃষ্ট বচনের দ্বারা লাভ বা আয়ত্ত্ব করা যায় না। ধারণাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি তথা মেধা কিংবা বহুশাস্ত্রবাক্য শ্রবণের দ্বারাও জানা যায় না। যার প্রতি এই আত্মা অনুগ্রহ করে তার সামনে এই আত্মা নিজের স্বরূপকে প্রকাশ বা প্রকটিত করে।

এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে—আত্মা বা ব্রহ্ম স্ব প্রকাশ। তাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয় নি, হবেও না। আত্মতত্ত্ব সাধন বা ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানযোগের বিষয়। সার্বিক এক পরম সত্তাকে বোধে আনার মাধ্যম হলো—জ্ঞানযোগ। অবশ্য এই পরমসত্তাকে নিষ্কাম কর্মযোগ, পরাভক্তি ও রাজযোগের মাধ্যমেও বোধে আনা যায়।

জ্ঞানযোগ সাধন করতে গেলে—বিবেক, বৈরাগ্য, মুমুক্ষুত্ব ও ষট্সম্পত্তি এই চারটি—মার্গ বা অবস্থাকে গ্রহণ করতে হয়। বিবেক—কোনটা সৎ এবং কোনটা অসৎ তা ঠিক করার নাম বিবেক। বৈরাগ্য—অসতের প্রতি অনীহা বা আকর্ষণ অনুভব না করার নাম—বৈরাগ্য। মুমুক্ষুত্ব—অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা থেকে মুক্তি লাভের ইচ্ছাকে বলা হয়—মুমুক্ষুত্ব। ষট্সম্পত্তি—শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান এই হলো ছয়টি বিষয়। একে সম্পত্তি বলা হয় এই কারণে যে, এর মাধ্যমে জ্ঞানযোগ বা আত্মতত্ত্ব সাধন করা হয়।

শম্—অন্তরেন্দ্রিয় দমন। দম্—বাহ্যইন্দ্রিয় দমন। তিতিক্ষা—কষ্ট সহ্য করে সাধন। উপরতি—কোন কিছুকে এড়িয়ে থাকা। শ্রদ্ধা—শাস্ত্র বাক্যে এবং গুরুবাক্যে বিশ্বাস। সমাধান হলো—যোগ।

যোগ---একের সাথে অন্যের মিলনকে বলা হয়—যোগ। গীতার মতে অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নাম—যোগ। সাধারণভাবে বলা হয়—জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনই যোগ। পতঞ্জলির যোগদর্শনের মতে—চিত্তের বৃত্তিকে নিরোধ করার নাম—যোগ। যোগদর্শন সমগ্র সাধন পদ্ধতিকে আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছে। তাই একে অষ্টাঙ্গ যোগ বলে। রাজযোগের অষ্ট অঙ্গ হলো—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

যম—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এই হলো যম এর পাঁচটি বিষয়।

নিয়ম—পাঁচটি। যথা—শৌচ, সন্তোষ, সাধ্যায়, তপস্যা, ঈশ্বর প্রণিধান।

আসন—শরীরকে বিশেষ অবস্থায় স্থিরভাবে রাখার নাম আসন। শরীরকে ঝরঝরে ও তরতাজা রাখাই আসনের কাজ।

প্রাণায়াম—প্রাণের আয়াম বা বিস্তার। প্রাণায়াম অভ্যাসের ফলে মন শান্ত হয় এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

প্রত্যাহার—মনকে কোন বিষয় থেকে সরিয়ে আনার নাম প্রত্যাহার।

ধারণা—কোন এক বিশেষ বিষয়ে মনকে একাগ্র ভাবে ধরে রাখাকে বলা হয়—ধারণা।

ধ্যান—ধারণাকে দীর্ঘস্থায়ী করার নাম—ধ্যান।

সমাধি—মনকে সম্যক্‌রূপে আত্মশক্তিতে ধারণ করে রাখাকে বলা হয়—সমাধি।

যোগের সমস্ত ক্রিয়া যোগ্য গুরুর সান্নিধ্যে থেকে করা উচিৎ।

জ্ঞানযোগ সাধন করতে হলে রাজযোগ অভ্যাস করা বিশেষ প্রয়োজন আছে। কারণ যোগ অভ্যাসের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ চিত্ত জ্ঞানযোগ সাধনের সহায়ক, সাধকের শুদ্ধ চিত্ততে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হয়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্‌গীতায় অর্জুনকে বার বার বলেছেন—হে অর্জুন! তুমি যোগমুক্ত হও।

কর্তব্যকর্মরূপ ধর্মের মধ্য দিয়ে প্রবৃত্তি মার্গে চলতে চলতে ক্রমে মানব মন বিচারের মাধ্যমে নিবৃত্তি মার্গকে অনুসরণ করে জ্ঞানযোগ সাধনে ব্রতী হওয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ধ্যানযোগের এক শ্লোকে বলেছেন—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ সুদুষ্করম্।।
—গীতা-৬।৩৫

অর্থ ঃ হে মহাবাহো, নিঃসন্দেহে মন খুবই চঞ্চল এবং একে বশে রাখা খুবই দুষ্কর। কিন্তু হে কৌন্তেয়, বৈরাগ্য সহকারে ধ্যান অভ্যাসের দ্বারা একে সংযত বা বশ করা যায়।

বশীভূত মন—নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা, পরাভক্তির সাহায্যে, রাজযোগ অভ্যাসের দ্বারা এবং বিচার বিশ্লেষণ যুক্ত জ্ঞানযোগ সহকারে পরমসত্য, পরমতত্ত্বকে বোধে আনতে সক্ষম হয়। পরমসত্যকে কর্মযোগে বলা হয়েছে—পরাশক্তি। ভক্তিযোগে একে বলা হয়েছে—ঈশ্বর ও ঈশ্বর দর্শন। রাজযোগে এই পরমসত্যকে বলা হয়েছে—পরমাত্মা। জ্ঞানযোগে একে বলা হয়েছে—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান বা মুক্তি।

একম্ সৎ, বিপ্রা বহুধা বদন্তি। একই সৎ আছে। বিপ্রগণ তথা জ্ঞানীগণ একে বহুভাবে বর্ণনা করেছেন। ভাব ও ভাষার তারতম্যে এই পরমসত্য বিভিন্ন রূপে বর্ণিত হলেও পরমসত্য ব্রহ্ম শেষ পর্যন্ত একক সত্তা ব্রহ্ম থেকে যায়। দেশ-কাল ও কার্য-কারণ তত্ত্বের মধ্য দিয়ে যখন আমরা এই ব্রহ্মকে দেখি বা দেখার চেষ্টা করি তখন আমরা পাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য জগৎ। অপর দিকে যখন আমরা এই ব্রহ্মকে দেশকাল ও কার্য-কারণ তত্ত্বের বাহিরে বোধে আনি তখন আমরা পাই আনন্দঘন শুদ্ধ ব্রহ্মকে। এই শুদ্ধ ব্রহ্মকে যখন নিষ্কাম কর্মযোগের ধারাতে গ্রহণ করি তখন আমরা পাই পরাশক্তি রূপে। অর্থাৎ ব্রহ্মকে তখন আমরা পাই ঈশ্বররূপে। রাজযোগে এই ব্রহ্মকে বলা হয়—পরমাত্মা। জ্ঞানযোগে একে পাই আত্মবোধরূপে। সার্বিকভাবে বেদান্ত একে বলেছে—মুক্তি। দেশ-কাল ও কার্য-কারণ তত্ত্বের মধ্যে বলা হয়—'ব্রহ্ম' তিনি বলেন, চলেন, শুনেন, করেন, তিনি দেখেন। আর দেশ-কাল ও কার্য-কারণ তত্ত্বের বাহিরে—'ব্রহ্ম' তিনি বলেন না, চলেন না, শুনেন না, করেন না, দেখেন না।

অতএব ভক্তি, কর্ম, যোগ ও জ্ঞান যে পথেই যাওয়া যাক না কেন, শেষ পর্যন্ত একের জ্ঞানই আসল কথা। এক কে জানাই জ্ঞান, এক কে জানাই মুক্তি, এই মুক্তি হলো জীবের প্রকৃতরূপ। অর্থাৎ জীবের প্রকৃতরূপ হলো—ব্রহ্ম। তাই আচার্য শংকর বলেছেন—জীব ব্রহ্ম না পরঃ। জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয়।

অবিদ্যা জনিত ভ্রমের জন্য জীব বাসনা লিপ্ত হয়ে তার আপন স্বরূপকে ভুলে যায়। অবিদ্যার নাশ হলে এক পরম সত্তায় মন নিবিষ্ট হয়ে যায়। তখন তার কাছে জগৎ বলে আর কোন কিছুই থাকে না। এমন কি মনেরও কোন ক্রিয়া থাকে না। তখন দেশ, কাল, কার্য-কারণতত্ত্ব কোন কিছুই থাকে না। তখন যা থাকে তা শুদ্ধ আনন্দঘন ব্রহ্মসত্তা সুতরাং মানুষ চতুর্বর্গকে আশ্রয় করে উত্তরণের মাধ্যমে সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করে অবিদ্যা থেকে বা অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়—জানতে পারে আপন স্বরূপকে। আত্মস্বরূপকে জানাই মানব জীবনের চূড়ান্ত উত্তরণ।

ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।।

সাধুর ষোলআনা ত্যাগ দেখলে অন্যলোকে ত্যাগ করতে শিখবে। তা না হলে তারাও পড়ে যাবে। সন্ন্যাসী জগদ্‌গুরু।
—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

শ্রী গোলোক সেন

প্রশ্ন ঃ ঈশ্বর দর্শন কি এই চক্ষে হয় ?

উত্তর ঃ তাঁকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না। সাধনা করতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয়—তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ, সেই চক্ষে তাঁকে দেখে—সেই কর্ণে তাঁর বাণী শুনা যায়। আবার প্রেমের লিঙ্গ যোনি হয়।

ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালবাসা না এলে হয় না। খুব ভালবাসা হলে তবেই তো চারিদিকে ঈশ্বরময় দেখা যায় খুব ন্যাবা হলে তবেই চারদিকে হলদে দেখা যায়।

তখন আবার 'তিনিই আমি' এইটি বোধ হয়। মাতালের নেশা বেশি হলে বলে, 'আমিই কালী'।

গোপীরা প্রেমোন্মত্ত হয়ে বলতে লাগল, 'আমিই কৃষ্ণ'। তাঁকে রাতদিন চিন্তা করলে তাঁকে চারিদিকে দেখা যায়, যেমন—প্রদীপের শিখার দিকে যা একদৃষ্টে চেয়ে থাক, তবে খানিকক্ষণ পরে চারিদিক শিখাময় দেখা যায়।

চৌধুরী—তাঁকে কিরূপে দর্শন করা যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—এচক্ষে দেখা যায় না। তিনি দিব্যচক্ষু দেন, তবে দেখা যায়। অর্জুনকে বিশ্বরূপ—দর্শনের সময় ঠাকুর দিব্যচক্ষু দিয়েছিলেন।

তোমার 'ফিলজফিতে' কেবল হিসাব করে। কেবল বিচার করে। ওতে তাঁকে পাওয়া যায় না।

যদি রাগভক্তি হয়—অনুরাগের সহিত ভক্তি—তাহলে তিনি স্থির থাকতে পারেন না।

ভক্তি তাঁর কিরূপ প্রিয়—খোল দিয়ে জাব যেমন গরুর প্রিয়—গবগব করে খায়।

রাগভক্তি—শুদ্ধাভক্তি—অহেতুকী ভক্তি।

যেমন প্রহ্লাদের।

সূত্র ঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (অখণ্ড), পৃ. ৬৯ ও ১৬২

প্রশ্ন ঃ ভক্তিমতী সুরমাদেবীকে মরণাপন্ন রোগ থেকে শ্রীশ্রীমা কেমন ভাবে রক্ষা করেছিলেন ?

উত্তর ঃ ১৯৩২ সালের মার্চ মাসে দোল পূর্ণিমার দিন আবীর খেলার সময় সুরমাদেবীর কানের ঠিক পেছনে কোন ছেলের অসাবধানবশত রংয়ের ঘটির প্রচণ্ড আগাত লাগে। সুরমাদেবী অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। এই প্রসঙ্গে শ্রীমা সারদার মন্ত্রশিষ্য অক্ষয় চৈতন্য জানান—"কান দিয়া দুই একদিন জল পড়িবার পর রক্ত ও পুঁজ পড়িতে আরম্ভ করে। অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে থাকে। জন্মাষ্টমীর রাত্রে যন্ত্রণা ভীষণাকার ধারণ করিল এবং যা মস্তিষ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রাত্রের মধ্যেই একটা কিছু হইয়া যাইবে—এইরূপ নিশ্চিত অভিমত দিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

সেই রাত্রে রোগিণী অনবরত ভুল বকিতে বকিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"আমার ঘাড়ের উপর কে বসল ? আমি কি এত ভার সহিতে পারি ? আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শিগ্‌গির আলো জ্বাল দেখি।" তারপর প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "মা এসেছিলেন। তাঁর পরণে লাল নরুণ পেড়ে কাপড়।" তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। পরদিন ডাক্তার আসিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, রোগ সারিয়া গিয়াছে। কানের ভিতর আঁচড়ের দাগের মত দেখা যাইতেছে। তাহা ছাড়া কোথাও কিছু নাই। তিন চারদিন পরে তাহাও আর দেখিতে পাওয়া গেল না।

সূত্র ঃ শ্রীশ্রীসারদাদেবী—ব্রঃ অক্ষয় চৈতন্য, পৃ. ১৫৪

প্রশ্ন ঃ কলকাতা হাইকোর্টে বেলুড় মঠের একটি কঠিন মামলা ওঠবার পূর্বে উকিল অহিভূষণকে 'শ্রীমাসারদার অলৌকিক আশীর্বাদ' কেমন ভাবে হয়েছিল ?

উত্তর ঃ ১৯৬৬ সাল। বেলুড় মঠের একটি কঠিন মামলা দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে অত্যন্ত জটিল অবস্থায় অমীমাংসিত ভাবে পড়ে আছে। বেলুড় মঠের বড় বড় হাইকোর্টের ব্যারিস্টারগণ বলেছেন যে এই মামলার মীমাংসা হওয়া অসম্ভব।

কিন্তু এই মামলার মীমাংসা ও জয়লাভ করবার দায়িত্ব নিলেন একজন উকিল। তাঁর নাম অহিভূষণ বসু। তিনি বেলুড় মঠের অনেক মহারাজের স্নেহধন্য। প্রাক্তন সভাপতি (২০১০ সালে) স্বামী আত্মস্থানন্দজী তাঁর বাল্যবন্ধু। যাই হোক, আদালতে উপরোক্ত দীর্ঘস্থায়ী মামলা ওঠবার দিন মাতৃভক্ত অহীভূষণ বসু ভবানীপুরে তাঁর চেম্বারে শ্রীশ্রীমা সারদার ফটোর সামনে অত্যন্ত কাতর ভাবে প্রার্থনা করছেন। এই সময় ঘটলো বিদেহিনী শ্রীমায়ের এক অলৌকিক লীলা।

এই প্রসঙ্গে অহীভূষণ বাবু জানান যে, "শুনানির দিন পূজ্যপাদ সুধীন মহারাজ গদাধর আশ্রম (ভবানীপুর) থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণের ফুল নিয়ে চেম্বারে এলেন।

আমি কোর্টের পোষাকাদি পরে তৈরী। মহারাজকে বললাম, "আপনি গাড়ীতে গিয়ে বসুন। আমি দরজা বন্ধ করে আসছি।" মামলার ব্রিফ হাতে শ্রীশ্রীমায়ের পটের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে কেঁদে ফেলেছি—"মা, বড় ভয় করছে। কি হবে?" সামনের পট, পলকে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলো। একি দেখছি আমি? বিশ্বাস করা কঠিন। ফ্রাঙ্ক ডোরাকের আঁকা। শ্রীশ্রীমায়ের পট। দেখছি শ্রীশ্রীমায়ের ডান হাতখানা বেরিয়ে আমার মাথা স্পর্শ করলো। চোখ আমার জলে ঝাপসা। আমি মাটিতে শুয়ে প্রণাম করে দৌড়ে তালা দিয়ে ছুটে গিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। পূজ্যপাদ সুধীন মহারাজের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করে বললাম, "মহারাজ, আজ জগতের কোন শক্তি আমাকে বিমুখ করতে পারবে না। আজ শ্রীশ্রীমা নিজে তাঁর ডান হাত খানা আমার মাথার ওপর রেখে আশীর্বাদ করে দিয়েছেন—হ্যাঁ, মহারাজ, বিশ্বাস করুন।"

কোট বসলো। দশ মিনিট আমি বললাম। জজ বললেন, "আমি মিস্টার চ্যাটার্জির কথা শুনবো। আপনি বসুন, আমি সব বুঝেছি।" বললেন লাঞ্চের পর অর্ডার দেবেন। লাঞ্চ কাটালাম। কোর্ট বসলো। অর্ডার শোনালেন, আমরা জিতলাম। একি ম্যাজিক না মিরাকেল জানি না। শ্রীশ্রীমায়ের পক্ষে সব সম্ভব।"

সূত্র ঃ শতবর্ষের আলোকে বেলুড় মঠ—অহীভূষণ বসু

প্রশ্ন ঃ স্বামী সারদানন্দ ঠাকুর সম্বন্ধে কি বলেছিলেন ?

উত্তর ঃ তিনি বলেছিলেন—"অদ্ভুত ঠাকুরের অমানুষী আকর্ষণে যতই আকৃষ্ট হতে লাগলুম, বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ততই দূর সরে যেতে লাগলো, তখন মনে হতো, একাধারে ইনিই (ঠাকুর) আমার সর্বস্ব, আর তাঁর ভক্তেরা আমার আপনার হতে আপনার। সত্যই ঠাকুরের আকর্ষণ বেহিসেবী।"

সূত্র ঃ শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী
—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ২৩

প্রশ্ন ঃ অনুজ মহেন্দ্রনাথ স্বামীজীর সংগীতের একদিনের স্মৃতি স্মরণ করে কি বলেছিলেন ?

উত্তর ঃ একদিন "বিল্বমঙ্গল" অভিনয় সমাপ্তির পর দর্শকবৃন্দ সকলে চলে গেলে গিরিশ বাবু নরেন্দ্রকে নিয়ে রঙ্গমঞ্চে ঢুকলেন। তখন ভিড় নেই—নর্তক-নর্তকীগণ চারিদিকে দণ্ডায়মান। নরেন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চতে একটি তানপুরা নিয়ে স্থিরভাবে ভজন গাইতে আরম্ভ করলেন। স্বভাব সিদ্ধ একাগ্রতায় গভীর ধ্যানে নিমগ্ন তাঁর শক্তি জেগে উঠল। চক্ষু নিমীলিত, কণ্ঠ হতে ভক্তিপূর্ণ স্বর উঠছে এবং দুই চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা বিগলিত হচ্ছে। ঠিক যেন নরেন্দ্রনাথ নিজের ইষ্টকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে সুস্বরে আহ্বান করছেন। স্থানটি নর্তকাগার থেকে দেবমন্দিরে পরিণত হল, ভক্তি ও ঈশ্বরানুরাগ চতুর্দিকে যেন প্রবাহিত হতে লাগল। বায়ু যেন ধর্ম, পবিত্রতা ও ঈশ্বরানুরাগে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। চপল স্বভাবের নর্তকীবৃন্দ তখন ত্রস্ত হয়ে উঠল এবং কার সম্মুখে পূর্বে তারা চাপল্যভাব প্রকাশ করেছিল এই চিন্তায় তারা কম্পিত ও ত্রস্ত হয়ে এবং করজোড়ে অতি বিনীতভাবে দূরে দণ্ডায়মান রইল।"

সূত্র ঃ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩,
মহন্দ্রেনাথ দত্ত।

প্রশ্ন ঃ ১৮৮৭ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী শিবরাত্রির সকালে স্বামীজী 'তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা' গানটি শিবানন্দ প্রমুখ গুরুভাইদের সঙ্গে গেয়েছিলেন। গুরুভাই অভেদানন্দ এই প্রসঙ্গে কি লিখেছেন ?

উত্তর ঃ "নরেন্দ্রনাথ এমন 'শিবের আবেশে' তন্ময় হয়ে গানটি গেয়েছিলেন যেন ভোলানাথ নিজেই গেয়েছিলেন যেন ভোলানাথ নিজেই নিজের মহিমা প্রকাশ করছেন। সে এক সুন্দর পরিবেশ। নরেন্দ্রনাথের কিন্নর কণ্ঠে ভাবগম্ভীর সেই গানের স্মৃতি আজও আমার মনে জাগরুক আছে।" সূত্র ঃ চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, পৃ. ৫৭০

পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ একখানাও পুস্তক সঙ্গে থাকবে না। বইয়ে—শাস্ত্রে—বালিতে চিনিতে মিশেল আছে। সাধু চিনিটুকু লয়ে বালি ত্যাগ করে। সাধু সার গ্রহণ করে। -শ্রীরামকৃষ্ণদেব

স্বামীজীর ভাষায় ঃ বৃহত্তের চিন্তাই প্রকৃত সার্বজনীন ধর্ম

ড. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রকৃত শিক্ষার বিষয়ে নৈতিক শিক্ষারও যে একটা স্থান থাকা উচিত এব্যাপারে স্বামী অভেদানন্দজীর একটা সুস্পষ্ট মতামত ছিল। তবে তিনি সমগ্র নীতিবিজ্ঞানকে ভালবাসার ওপর নির্ভরশীল হবার কথা বলেছেন। যে ভালবাসা বা প্রেম নিঃস্বার্থ তা পরস্পরের অভিন্নতাই প্রতিপাদন করে। প্রেমাস্পদের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়াই হল ভালবাসা, তা না হলে তাকে ভালবাসা বা প্রেম বলা যায় না। প্রেমের অর্থ সমানভাবে আকর্ষিত দুটি হৃদয়ের বিনিময়। একই সুরে বাঁধা দুটি বাদ্যযন্ত্রের মতো একটার স্পর্শে অপরটির বেজে ওঠা। প্রেমিকের চিন্তা ও ধারণা প্রেমাস্পদের মনে সংক্রামিত হয়ে যখন অনুরূপ চিন্তা ও ধারণার উদ্রেক করে তখনই বুঝতে হবে যে, তাদের প্রেম সত্য এবং তারা মনে ও প্রাণে এক; প্রকৃত প্রেমে স্বার্থপরতার স্থান নেই। প্রেমিক তাঁর প্রেমাস্পদের জন্য নিজের সবকিছু উৎসর্গ করতে পারে। কারণ সে জানে যে সর্বস্বই প্রেমাস্পদের, সে বলে 'বন্ধু তোমার প্রয়োজন আমার অপেক্ষা বেশি। আমার যা কিছু আছে সবই তোমার' বিশ্ব মানবতার বিরাট ব্যক্তিত্বে আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব ডুবিয়ে দেওয়াই হল নৈতিক শিক্ষার আদর্শ।

যীশুখ্রীষ্টের মত দিব্যশক্তি সকল মানুষেই সুপ্ত আছে, প্রত্যেক মানুষই ঈশ্বরের অংশ বা স্বরূপ। সকলেই ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী। মানবের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসরূপ মূলতত্ত্বের উপর যে শিক্ষা প্রণালী স্থাপিত তাই সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা।

আমাদের সামাজিক জীবনে শিক্ষার ঐ আদর্শের প্রয়োগ কিরূপে সম্ভব? স্বামী অভেদানন্দজী বলেছেন—ওতে অসম্ভব কিছু নেই। মনের সংকীর্ণতা দূর করে বহুত্বের ভিতর একত্বরূপ আদর্শটিকে আমাদের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং তা মেনে নিয়ে সহিষ্ণু হতে হবে। তোমার নিজের পথই তোমার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি এনে দেবে। বাগানে বিভিন্ন শ্রেণীর বৃক্ষের মধ্যে কেউ কি দুটিকে একই প্রকার দেখবার বা একই ফল উৎপন্ন করবার জন্য চেষ্টা করে?—না, তা করে না; কারণ তা হলে বাগানের সমস্ত বৃক্ষই নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের এই পৃথিবীটাও যেন একটি বাগান ও প্রত্যেক মানব এক একটি বৃক্ষের ন্যায়। প্রত্যেককে তার নিজের মতন করে বাড়তে ও ফল দানের অবসর দেওয়াই আমাদের আদর্শ। একজন কেন অপরের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতির অন্তরায় হবে? নিষেধের হাত সরিয়ে ও প্রতিবন্ধকের বেড়া অপসারিত করে নাও; চারপাশে যথাযোগ্য অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি করে তাকে অবাধ স্বাধীনতায় বাড়তে দাও, দেখবে সে সর্বোৎকৃষ্ট ফলদান করবে। বৃক্ষ যেমন যথাযোগ্য আলোক, উত্তাপ, ভূমি, জল ও বাতাস প্রভৃতির সাহায্য ব্যতিরেকে সুফল দান করতে পারে না, পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল না হলে মানবও সেরূপ উন্নতি লাভ করতে পারে না। মানুষকে জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শের বিকাশে সহায়তা করতে হলে তাকে যথাযোগ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার বেষ্টনীর মধ্যে রাখতে হবে। এটাই আমাদের কর্তব্য। চণ্ডালকে আপনারা ঘৃণা করেন; কিন্তু ভেবে দেখেন না—কেন সে আজ চণ্ডাল? কে-ই বা তার এরূপ অবস্থার জন্য দায়ী? আজ তাকে ব্রাহ্মণের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে রেখে দিন, দেখবেন—কাল সে ব্রাহ্মণ হবে। সে আবর্জনা স্তূপের মধ্যেও বাস করে বলে তার দোষ দেবেন না। তাকে সর্বনিকৃষ্ট শ্রেণীতে ফেলে তার চারপাশে অধোগতির আবেষ্টনী দিয়ে আপনারাই তাকে ঘৃণা করেন! দোষী-সে নয়, দোষী বরং সমাজের নেতা আপনারাই। সমস্ত দোষ নিজেদের কাঁধে তুলে তাদের সংশোধন করে সভ্য ও সাধু করে তুলুন। যোগ্য শিক্ষা, দীক্ষা ও ভালবাসা দান করে তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুবিধা দিন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভূত পূর্ব রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন (Abraham Lincoln) যিনি দাসত্ব প্রথা রোধ করেন—একবার ওয়াশিংটন শহরের রাজপথে এক বন্ধুর সঙ্গে ভ্রমণ করবার সময় দেখতে পেলেন যে, একটি গুবরে পোকা চিত হয়ে পড়ে উপুড় হবার চেষ্টা করছে। তিনি তখনই তাকে ধরে সোজা করে বসিয়ে দিলেন এবং বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে বললেন—"আমি বেচারাকে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করলাম।" আমি আশাকরি যে আপনারা পতিত, দুর্গত ও অসহায় মানবদের উপর অত্যাচার বা ঘৃণা না করে ও তার

দোষ না দেখে আব্রাহাম লিঙ্কনের মতন বরং যোগ্য সুবিধা দানে তাদেরকে তাদের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করবেন এবং তাদের ঠিক নিজের মতন ভালবাসবেন, স্কুল ও কলেজ সমূহে এরূপ শিক্ষার প্রবর্তন করলে শিক্ষকমণ্ডলীর সম্মুখে সকলেই শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করবে এবং তাঁরাও অলংকৃত পদের উপযুক্ত বলে গণ্য হবেন। ঈশ্বরও এইরূপ মানব পুজোয় পরম সন্তুষ্ট হবেন। মনের সমাজের বাইরে কোথায় ঈশ্বরকে খুঁজে পাবেন? ঈশ্বর মেঘের উপর অসীম হয়ে নেই। তিনি সর্বদা সর্বত্রই বিরাজিত।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন, আত্মজ্ঞান লাভ করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য, আত্মা-যিনি জন্ম-মৃত্যু, ক্ষয়-বৃদ্ধি ও সমস্ত-কিছু পরিবর্তন ও দ্বৈত বস্তুর সংস্পর্শ থেকে পূর্ণমুক্ত সেই পূর্ণ ও অখণ্ড চৈতন্যসত্তার উপলব্ধির নামই 'আত্মজ্ঞান', আত্মজ্ঞান উপলব্ধিরই স্বরূপ—Self-Knowledge is realization.

তবুও প্রশ্ন হতে পারে যে, আত্মা চেতন বা চৈতন্যস্বরূপ হলেও মানুষের মধ্যেই তাঁর সমধিক প্রকাশ কিন্তু বৃক্ষ-লতা, গ্রহ-উপগ্রহ অথবা জড়বস্তুতে তাঁর সত্তা স্বীকার করব কেন? আমরা চেতন ধর্মী তাকেই বলি যা কথা বলতে পারে, সুখ দুঃখ অনুভব করতে পারে অথবা প্রশ্ন করলে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। গাছ, লতা, বা জড়পদার্থে এর কোনটির লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না; সুতরাং এদেরকে প্রাণহীন অচেতনই বলতে পারি। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী বলবেন তা কেন? এই বিশ্বচরাচরে অচেতন বলে কোন জিনিসই থাকতে পারে না। বৃক্ষ, লতা প্রভৃতিকে আমরা চেতন বলি কারণ তারাও বাঁচবার জন্য জীবনসংগ্রাম (Struggle for Existence) করে থাকে; তাদেরও ক্ষয় বৃদ্ধি থাকে তারাও সুখ-দুঃখ অনুভব করে, সুতরাং আত্মচেতনা বা প্রাণের লক্ষণ হতে তারা বঞ্চিত নন। উপনিষদে এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও বৃক্ষ লতার প্রাণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। স্বর্গীয় জগদীশচন্দ্র বসু গাছের যে প্রাণ আছে একথা প্রমাণ করেছেন। মোট কথা যে বস্তুর বৃদ্ধি ও ক্ষয় আছে, যে বস্তু প্রকৃতির পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকবার চেষ্টা ও শক্তি প্রদর্শন করে, সেই বস্তুই চেতন ও গুণবান, আমরা একখণ্ড পাথর বা কাঠের তৈরী টেবিলকে অচেতন বস্তু বলে অবজ্ঞা করে থাকি, কিন্তু বিচার করে দেখলে দেখতে পাই যে, একটি পাথর বা টেবিলে আঘাত করলে তা সেই আঘাত সহ্য করে, আবার প্রতিঘাতে তা আমাদের ফিরিয়ে দেয়। তার পরমাণুগুলির মধ্যে যথেষ্ট একতা বা সঙ্ঘবদ্ধতা আছে, কারণ আঘাত করলেও তা কিন্তু বিচ্ছিন্ন বা শিথিল হয়ে পড়ে না, এইভাবে আবদ্ধ থেকে তার প্রাণের পরিচয় আমাদের কাছে জ্ঞাপন করে থাকে। জড় পদার্থের পরমাণুগুলির সংহত অথবা একত্র হয়ে থাকবার প্রচেষ্টা ও লক্ষণ হতে প্রমাণ হয় যে, তাদেরও সংজ্ঞা আছে, তারাও চৈতন্য বান এবং প্রাণবান।

সমস্ত বস্তুর মধ্যে এই যে সংগ্রাম করে, সহ্য করে বেঁচে থাকবার প্রবৃত্তি ও আকুলতা এটাই প্রাণের লক্ষণ। এই প্রাণকেই উপনিষদে 'প্রজ্ঞা' বলা হয়। এই 'প্রজ্ঞা'ই বোধি বা জ্ঞান (Higher intelligence or consciousness) সমস্ত আপেক্ষিক জ্ঞানের অধিষ্ঠানই 'প্রজ্ঞা'। আত্মা বা প্রজ্ঞা থেকে জ্ঞানের সৃষ্টি হয় না, আত্মা বা প্রজ্ঞা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ। স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ তাঁর 'আত্মজ্ঞান' গ্রন্থে এই তত্ত্বগুলিই সূক্ষ্ম বিচার করে প্রমাণ করেছেন যে, সমস্ত জিনিসের মধ্যেই প্রাণ ও প্রজ্ঞা আছে এবং সকলেই আত্মা বা ব্রহ্ম হতে পৃথক নয়।

প্রাণ বা প্রজ্ঞার সংখ্যা বহু নয় তা একমেবাদ্বিতীয়ম্। যে জীবনীশক্তি আপনার ভিতর আছে, সেই জীবনীশক্তিই আমার এবং অপরের ভিতরেও আছে। জীবনীশক্তি যেমন বহু নয় পরন্তু এক, প্রজ্ঞাও তেমনি এক, সুতরাং আপনার মধ্যে যে প্রজ্ঞা বর্তমান সেই প্রজ্ঞাই আমার এবং অপরের মধ্যেও বর্তমান, এই নিখিল বিশ্বের সর্বত্রই 'প্রাণ' বা 'প্রজ্ঞা' একটি ভিন্ন দুটি নয়। অপরের প্রজ্ঞার সঙ্গে আমাদের প্রজ্ঞার তুলনা করে পরস্পরের বৈশিষ্ট্য কেবল বাহ্যলক্ষণ দ্বারাই অনুমিত হতে পারে। সব রকম জ্ঞানের মূলে 'প্রজ্ঞা' অবস্থিত। কোন বাক্য উচ্চারিত হলে ঐ বাক্যের তাৎপর্য প্রজ্ঞা বা 'অহমস্মি' জ্ঞান না থাকলে বুঝতে পারা যায় না। কানের দ্বারা কোন শব্দ শোনা প্রজ্ঞা ছাড়া সম্ভব নয়। যখন তা কোন বিষয়ে বিশেষভাবে নিবিষ্ট থাকে তখন অন্য কোনও বস্তু আমাদের চোখের অতি কাছে থাকলেও আমরা

দেখতে পাই না। "ন হি প্রজ্ঞাপেতং চক্ষু রূপং কিঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্যত্র মে মনোহভূদিত্যাহ নাহমেতদ্রূপং প্রজ্ঞাসিষমিতি।" (কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।৭)

সংক্ষেপে এটাই বলতে পারা যায় যে প্রজ্ঞা ছাড়া ক্রমিক উৎপন্ন হয় না, অর্থাৎ একটি চিন্তা দূর হওয়ার পর অপর একটি চিন্তার উদয় হয় না আবার প্রজ্ঞা ছাড়া কোন বিষয় জানতে পারা যায় না। যে জন্য উপনিষদে বলা হয়েছে, "প্রকৃত দ্রষ্টাকেই আমাদের জানতে হবে। বাক্য বুঝতে চেষ্টা না করে সেটি যার দ্বারা উক্ত হয়েছে, সেই বক্তা বা পুরুষকেই জানতে চেষ্টা করবে।"

"ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত; বক্তারং বিদ্যাৎ", "ন রূপং বিজিজ্ঞাসীত, রূপবিদ্যাং বিদ্যাৎ....", "ন শব্দং বিজিজ্ঞাসীত, শ্রোতারং বিদ্যাৎ।" (কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।৮)

আমাদের এই রকম অনুভূতি হয়—যে আমি দর্শন করছি, সেই আমিই বলছি, শুনছি অতএব দ্রষ্টা, শ্রোতা ইত্যাদি রূপে একই চৈতন্য প্রতিভাত হচ্ছে। বহুরূপে প্রতিভাত হলেও কিন্তু তিনি স্বরূপতঃ এক ও অকর্তা—তিনি সাক্ষী মাত্র।

এবিষয়ে স্বামী অভেদানন্দজী বেশ কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন, দেবরাজ ইন্দ্র প্রজাকে রথচক্রের মধ্যস্থল বলে বর্ণনা করেছেন। এই দেহটি যেন একটি রথ এবং চক্রের পরিধিটি যেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি দ্বারা গঠিত। চক্রের নাভি হতে নেমি পর্যন্ত যে দণ্ডগুলি থাকে সেই 'অর' গুলি যেন বাহ্যবিষয় প্রকাশক ইন্দ্রিয় শক্তিসমূহ এবং চক্রের নাভিটি যেন প্রাণ বা জীবনীশক্তি।

"তদ্ যথা রথস্যারেষু নেমির্বর্ণিতো নাভাবরা অর্পিতা, এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্বর্পিতাঃ প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেহর্পিতাঃ স এষ প্রাণ এব প্রজাত্মানন্দোহজরোমৃতঃ।"

চিন্তা ব্যাপারটি কি তা জানতে চেষ্টা না করে, যিনি চিন্তা করছেন তাঁকে জানো, কারণ প্রত্যক্ষের বিষয়গুলি অর্থাৎ চিন্তা সুখ দুঃখ ইত্যাদির সঙ্গেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির সম্বন্ধ আছে। যদি বিষয়গুলির সঙ্গে বিষয়ী আত্মার এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ ইত্যাদি বিষয়ের সম্বন্ধ না থাকত তাহলে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া থাকত না এবং যদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া না থাকত তাহলে বিষয় গুলি থাকত না। কেবল বিষয় অথবা কেবল বিষয়ীর দ্বারা কিছুই সম্পন্ন হয় না।

"তা বা এতা দশৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞং, দশ প্রজ্ঞামাত্রা অধিভূতং। যদ্ধি ভূতমাত্রান স্যূর্ণ প্রজ্ঞামাত্রাঃ সূর্যদ্বা প্রজ্ঞামাত্রা ন স্যূর্ন ভূতমাত্রা স্যুঃ। ন হ্যন্যতরতো রূপং কিঞ্চন সিধ্যেৎ। নো এতন্নানা।"—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।৮

ওঁ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং কাউ দেবো যুনক্তি। কেনোপনিষৎ ১।১

(গুরুদেবকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন)

শিষ্য—কার অভিপ্রায় অনুসারে নিয়োজিত হয়ে মন নিজ বিষয়ে ধাবিত হয়? কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে সর্বপ্রধান প্রাণ নিজ কাজে গমন করে? কার অভিপ্রায় অনুযায়ী (মানুষ) এই বাক্য উচ্চারণ করে? কোন্ জ্যোতিষ্মানই বা চোখ ও শ্রোত্রকে নিজ নিজ বিষয়ে নিযুক্ত করেন?

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।। কেনোপনিষৎ ১।২

সৎকার্য অথবা অসৎকার্যের দ্বারা আমাদের প্রকৃত স্বরূপের কোনও প্রকার বৃদ্ধি হ্রাস, পায় না, সংসারের পাপ এই আত্মাকে কলুষিত করতে পারে না কিম্বা এর কোনও প্রকার পরিবর্তনও হয় না। আমাদের আত্মা ধর্মাধর্মরহিত, তিনি পাপীও হন না, বা পুণ্যবানও হন না। সব সময়ে তিনি পূর্ণ ও পবিত্র। সৎ ও অসৎকর্মের সঙ্গে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই বটে, কিন্তু এই সমস্ত কর্মের সঙ্গে জীবাত্মার যথেষ্ট সম্পর্ক আছে, কারণ যা কিছু করা যায় তার ফল জীবাত্মাই ভোগ করবেন; অর্থাৎ 'আমি' 'আমার' জ্ঞান নিয়ে আমরা যে রূপ কর্মই করিনা কেন, তার ফল আমাদের ভোগ করতেই হবে। তাছাড়া আমাদের উত্তমরূপে বুঝা উচিত যে, প্রজ্ঞা ও জীবনীশক্তি ব্যতিরেকে কোন প্রকার সদসৎ কর্মই সম্পন্ন হতে পারে না। জ্ঞান ও বুদ্ধির মূল কারণ যিনি, তিনিই এই বিশ্বজগতের অধিপতি ও সকলের পালনকর্তা। তিনিই এই পরিদৃশ্যমান বাহ্যজগতের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই আমার (ইন্দ্রের) প্রকৃত স্বরূপ।

"ন সাধুনা কর্মনা ভুয়োন্না এবাসাধুনা কনীয়ান্। এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম কারয়তি তং যর্মমভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। এষ উ এবৈনমসাধু কর্ম কারয়তি তং যমধো নিমীষতে। এষ লোকপালঃ এষ লোকাধিপতিঃ। এষ সর্বেশঃ স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ।"

—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।৮

অর্থাৎ এই আত্মা পুণ্যকর্ম দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না, অথবা পাপকর্মের দ্বারাও হ্রাসপ্রাপ্ত হন না। যেহেতু এই প্রাণ 'প্রজ্ঞা' উপাধি বিশিষ্ট আত্মাই স্বর্গাভিলাষী জীবকে এই প্রত্যক্ষ মর্ত্যলোক হতে উর্ধ্বলোকে নিয়ে যেতে ইচ্ছা করেন ও তাকে দিয়ে পুণ্য কর্ম করান, এই আত্মা জীবকে এই প্রত্যক্ষ মর্ত্যলোক হতে অধোলোকে নিয়ে যেতে ইচ্ছা করেন এবং তাকে দিয়ে অসাধু-কর্ম অর্থাৎ পাপ কর্ম করান। এই আত্মাই লোকপাল অর্থাৎ সাধু লোককে সুখ এবং অসাধু লোককে দুঃখ প্রদান করেন। এই লোকপাল আত্মাই লোকাধিপতি। এই লোকাধিপতি আত্মাই সর্বনিয়ন্তা। এই সর্বেশ্বরত্ব গুণসম্পন্ন আত্মাই আমার (ইন্দ্রের) স্বরূপ, এঁকেই জানতে হয়। উক্ত আত্মাকেই আমার স্বরূপ বলে জানতে হয়। তবে এটি সত্য যে আত্মা স্বরূপতঃ কাউকে পাপও প্রদান করেন না, অথবা পুণ্য দানও করেন না। আত্মা নিষ্ক্রিয় ও সাক্ষী স্বরূপ। একসময় আমাদের ভারতবর্ষের আদর্শ ছিল—

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।"

'বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হতে গরু, কুকুর চণ্ডাল প্রভৃতির মধ্যেও যিনি সার্বজনীন এক আত্মার অধিষ্ঠান দেখেন তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত, সমদর্শী বিদ্বান ও জ্ঞানী। কিন্তু বর্তমানে জনসাধারণ এটা বিস্মৃত হয়েছে এবং নিঃস্বার্থপরতা ও ভ্রাতৃভাবের স্থান আজ স্বার্থপরতা অধিকার করে বসে আছে। প্রাথমিক সংস্কৃত বইয়েও আমরা পড়ি যে,

"অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।।"

এটি 'আমার' বা 'তোমার' এই পার্থক্য শুধু ক্ষুদ্রচেতা মানবেরাই করে থাকে। যাঁদের মন উদার ও প্রশস্ত তাঁরা সমগ্র সংসারকেই আত্মীয় ভাবেন, "তোমার প্রতিবেশীদের ভালবাস।"—এটাই কি যীশুখ্রীষ্টের শিক্ষা নয়? তোমার প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, খ্রিস্টান, মুসলমান অথবা যেকোনো ধর্মের লোক হোক না কেন, তাকে ঠিক নিজের মত দেখতে হবে। মানুষ নিজেকে যেমন ভালোবাসে, অপরকেও ঠিক সেইরকম ভালোবাসবে। এটাই আমাদের ধর্ম। সার্বজনীন ধর্মের এই আদর্শ পরিহার করে যদি আমরা ব্যবসায় বুদ্ধি ও বাণিজ্যবাদের মোহে মত্ত হয়ে সেই উদ্দেশ্যে অর্থকরী বিদ্যারই চর্চা করি তাহলে কি তাকে শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ বলতে পারা যায়? শিক্ষা ব্যাপারে এবং সার্বজনীন ধর্মের আসনে অর্থনীতি ও ব্যবসায়, বুদ্ধিকে প্রতিষ্ঠিত করা মনুষ্যত্বের অধোগতির পরিচায়ক। বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার প্রত্যেক বিভাগ আমাদের জাতীয় আদর্শকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং এটাই হবে প্রকৃত সার্বজনীন ধর্ম।

—০—

রিক্তা দত্ত

ঠাকুর তুমি কী চাও বলো একটিবার
যথাসাধ্য করতে পারি এ তরী পার
বুঝিনা, সুযোগও পাইনা করতে কিছু
তুমি কে, কী কেন-দোলাচলে হঠি পিছু
কিছু একটু দেখালে পাইগো মনের জোর
সেই স্বপ্নে ঘটে যেন চৈতন্য মোর।
বিভোর হয়ে জপবো কেবল তোমার নাম
ব্রাত্য হবে ভোগ, পুরবে মনস্কাম
সারাজীবন খুঁজে সারা, তল না পাই
কতটা ডুবলে একটু পাবো তোমার লাই
আশ্বস্ত হলেই দেবো যতটা চাও
দোলাচলচিত্ততায় ভরা আমার নাও।
রামকৃষ্ণ নই ঠিকই তবু-মানুষ তো?
একটিবারও দেখা পাবার নেইকো জো?
তবে বৃথাই জনম আমার বৃথাই ভক্তি
দেখা দাও প্রাণনাথ, ফুরায় জীবনীশক্তি।

—০—

প্রথম যেদিন নরেন এল

শ্রী সুমন ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৪৬)

সঙ্গীত প্রিয়তা

নরেন্দ্রনাথ কৌতুকে রহস্য বিদ্রুপে, আমোদ-প্রমোদে, ক্রীড়ায়, সঙ্গীতে সমান পারদর্শী। ছাত্র অবস্থায় পাঠ্যপুস্তকই শুধু নয়, তার অধ্যয়নের গণ্ডিতে নভেল নাটক, বিভিন্ন মাসিক পত্রিকা, খবরের কাগজ ও সাময়িক রচনাদিও আছে। গণিত, ইতিহাস, কাব্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দর্শনের প্রতিও তার সমান নিষ্ঠা ও মনোযোগ।

আর সঙ্গীতের মধ্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি তার সমধিক আগ্রহ। আর এই আগ্রহ সে পেয়েছে পিতা-মাতার কাছ থেকেই। সঙ্গীতবিদ কলাবিদ্যার প্রতি পিতা বিশ্বনাথ দত্ত, ও মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী উভয়েরই সমান আগ্রহ। বিশ্বনাথ সুকণ্ঠের অধিকারী, গাইতে পারেন নিধুবাবুর টপ্পা। আর মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী বৈষ্ণব ভিক্ষুক ও রাতভিখারীদের ভজনগান একবার মাত্র শুনেই সুর তাল লয়ের সঙ্গে গান আয়ত্ত করে নেন।

নরেন্দ্রনাথ অতি-অল্প বয়সেই সঙ্গীতচর্চায় মনোনিবেশ করে। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ভালভাবেই জানেন পুত্রের প্রতিভার বিষয়। রামায়ণ, কথাবাতা, রামপ্রসাদী, কীর্তন যে কোন সঙ্গীতানুষ্ঠানই হোক না কেন সিমুলিয়া পল্লীর কোনো বাড়ীতে, নরেন্দ্রনাথকে তিনি সুযোগ দেন শোনার জন্য। নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠ যেমন সুমিষ্ট তেমনই সাবলীল।

পদাবলীকীর্তন, সহজিয়া গান, বাউল গান, রামায়ণ গান, ঝুমুর, তরজা, হাফ্‌আখড়াই, কথকতা, শ্যামাসঙ্গীত, বাংলা টপ্পা, টপখেয়াল প্রভৃতি গীতিরীতি শিক্ষিত ও সাধারণ সমাজে বহুল প্রচলিত, অন্যদিকে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজারামকৃষ্ণ, দাশরথি রায়, দেওয়ান, রঘুনাথ, নিধুবাবু, মধুকান, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি ভক্ত-সাধক ও চারণ কবিদের, গানেও তখন বাংলা সমৃদ্ধ, বাংলার দুর্গামণ্ডপ ও চণ্ডীমণ্ডপগুলি মুখরিত হাস্যপরিহাস সঙ্গীত ও বিচিত্র সরল আলোচনায়, হিন্দুস্থানী ক্ল্যাসিকাল গানের অনুশীলনও অব্যাহত অভিজাত বৈঠকগুলিতে ও ধনী জমিদারদের বৈঠকখানায়।

বাংলার সব গানের সঙ্গে বিশেষ করে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ নরেন্দ্রনাথের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তাছাড়া তাঁর বংশের সঙ্গীত সংস্কার সমৃদ্ধ করল নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত রুচি ও সঙ্গীত সাধনাকে। সিমুলিয়ায় দত্ত বংশের অমৃতলাল দত্ত (হাবুবাবু) সেসময় একজন বিখ্যাত বংশীবাদকরূপে খ্যাত, ভারতবিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব প্রথম জীবনে অমৃতলাল দত্তের নিকটই সঙ্গীত শিক্ষা করেন। কুমিল্লার সঙ্গীতশিল্পী হরিহর রায় এবং আরো অনেক বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীরা অমৃতলালের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। অমৃতলালের ভাই সুরেন্দ্রনাথ দত্ত ও (তমুবাবু) একজন বিখ্যাত যন্ত্রশিল্পী নামে পরিচিত।

এই বংশের ছেলে নরেন্দ্রনাথ। তাই যে কোন গান একবার শুনলেই সে অবিকল ভাবে তা প্রকাশ করতে পারে। পিতা বিশ্বনাথ তাই ঠিক করলেন পুত্রকে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের শিক্ষা দিতে। তার ব্যবস্থাও হল সমান সুচারুরূপে।

প্রবেশিকা শ্রেণীতে পাঠের সময় থেকেই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতশাস্ত্র ও সঙ্গীতবিদ্যার শিক্ষা শুরু হল সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিশারদ আহম্মদ খাঁর শিষ্য বেণী ওস্তাদের কাছে। বিশ্বনাথ চেয়েছিলেন নরেন্দ্র ওস্তাদের কাছ থেকে যেন রাগ-রাগিনী শেখে, তাল-লয় সম্বন্ধে যাতে বিধিমত উপদেশ পায়, সেই অনুযায়ী চার-পাঁচ বছর ধরে ঐ ওস্তাদের কাছে নরেন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষা করল, নরেন্দ্র বাজাতেও শিখেছিল, কিন্তু কণ্ঠ সঙ্গীতেই তার বিশেষ অনুরাগ ও দক্ষতা, নরেন্দ্র যেখানেই যায় সেখানেই অনুরোধ আসে গান শোনানোর। সকলেই নরেন্দ্রকে ওস্তাদের মত খাতির যত্ন করে এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে তাকে একজন বিশারদ হিসাবে গণ্য করে। প্রাচ্য-সঙ্গীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তুলনা দ্বারা নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছিল এবং উক্ত শাস্ত্রের একজন অভিজ্ঞ সমালোচক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নরেন্দ্রর হৃদয় সর্বদাই

দরিদ্রদের জন্য কাতর, এসময়েই দরিদ্র এক সঙ্গীতপুস্তক প্রকাশককে তাঁর পুস্তক বিক্রয়ের সুবিধা হবে বলে সে একজনকে ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্ব' সম্বন্ধে একটি প্রকাণ্ড মুখবন্ধ লিখে দিয়েছিল এবং শেষে নিজেও কয়েকটি সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত রচনা করেছিল। সঙ্গীতগুরু তাঁর প্রতিভা-দর্শনে মুগ্ধ হয়ে অন্যান্য শিষ্যের চেয়ে তাঁকে অনেক বেশি বিষয় শিক্ষা দিয়েছিল। সঙ্গীতগুরু জানতেন তাঁর এই ছাত্রটি শুধু নিজেরই নয়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও মুখোজ্জ্বল করবে। তাই প্রাণপণ যত্ন করে তিনি গান শেখাতেন নরেন্দ্রকে। তাঁরই কাছ থেকে নরেন্দ্র শিখে নিল অনেক হিন্দী, উর্দু ফার্সী গানও।

নরেন্দ্র আরও বেশ কিছু ওস্তাদের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করল।

নরেন্দ্র যেকোন বাদ্যযন্ত্রও ভালো বাজাতে পারে, তবলা, পাখোয়াজ প্রভৃতি চর্মবাদ্য এবং এসরাজ, সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রও সে শিক্ষা করল। যার কাছে সে তালিম নিচ্ছিল সেই বেণী ওস্তাদও কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয়বিধ সঙ্গীতেই পারদর্শী ছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের কাশী ঘোষাল নামে অপর একজন সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন। কাশী ঘোষাল আদি ব্রাহ্ম সমাজে পাখোয়াজ ইত্যাদি বাজাতেন।

এসময় বাদ্য (তবলা ও পাখোয়াজ) সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথ একখানি বইও লিখল এবং তা বটতলা থেকে বৈষ্ণবচরণ বসাক প্রকাশ করেছিলেন।

বেণী ওস্তাদের বাড়ী ছিল উত্তর কলকাতায় মসজিদবাড়ী স্ট্রীটে ঈশ্বর গুপ্তের বাড়ীর কাছে। ওস্তাদের বাড়ীর কাছাকাছি ছিল বিখ্যাত অম্বু গুহের বাড়ী ও কুস্তির আখড়া। শিক্ষক বা ওস্তাদের খোঁজ খবর সংগ্রহ করেছিল নরেন্দ্রনাথ নিজে, আর ঐ কাজে সাহায্য করেছিল কুস্তির আখড়ার সতীর্থরা। বাল্যকাল থেকেই কুস্তি ও বৈঠকে আগ্রহ ছিল নরেন্দ্রনাথের। কুস্তিগীর অম্বু গুহের সযত্ন শিক্ষাদানের মাধ্যমে নরেন্দ্রনাথ সবল, বলিষ্ঠ ও সুঠাম স্বাস্থ্যলাভ করেছিল।

এখানেই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল রাখালের। অম্বু গুহের পাড়ায়; বলা চলে বাড়ীর কাছেই বেণী ওস্তাদের বাড়ী। বাংলার বাইরে থেকে অনেক হিন্দু ও মুসলমান গাইয়েও আসতেন মাঝে মাঝে বেণী ওস্তাদের বাড়ী, আখড়ার কাছাকাছি হওয়ায় কুস্তি শেখার পর নরেন্দ্রনাথ গান শিখতে যায় বেণী ওস্তাদের কাছে।

নরেন্দ্রনাথের গায়কী পদ্ধতি সম্পূর্ণ উত্তর-ভারতীয় হিন্দুস্থানী পদ্ধতি অনুযায়ী বিশুদ্ধ তথা খানদানী। কারণ তার সঙ্গীত গুরু বেণী ওস্তাদ যার কাছে শিক্ষা লাভ করেন, সেই আহম্মদ খাঁ ছিলেন বিখ্যাত ধ্রুপদী এবং শাহ্ সদারঙ্গের শিষ্যবংশীয় প্রসিদ্ধ খেয়ালগানের ধারক। ওস্তাদ আহম্মদ খাঁ কিছুদিন আন্দুল রাজবাড়ীতে সভাগায়ক ছিলেন। তিনি ছিলেন বিশেষ ভাবে ধ্রুপদ ও খেয়াল গীতরীতির গায়ক, তবে টপ্পা-ঠুংরী প্রভৃতিও জানতেন ও শেখাতেন। শোনা যায়, এই আহম্মদ খাঁ ছিলেন লক্ষ্ণৌয়ের শঙ্কর খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁরা ছিলেন দুই ভাই। বড় আহম্মদ খাঁ আর ছোটভাই মহম্মদ খাঁ। তাঁরা শাহ সদারঙ্গের কাওয়াল শিষ্যবংশীয়।

১৮৭৯ থেকেই ১৬ বছরের নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে ও এরূপ অন্যান্য বেশ কিছু ধর্মসম্প্রদায়ে যাতায়াত শুরু করে। এর পূর্বেই নরেন্দ্র বেণী ওস্তাদের কাছে উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী গানের মত বাংলা গানও কিছু কিছু শিখেছিল। ব্রাহ্ম সমাজে মেলা মেশায় কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, আনন্দমোহন বসু, চিরঞ্জীব শর্মা, সঙ্গীত শিল্পী দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দীপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কুঞ্জবিহারী দেব, উমানাথ গুপ্ত, গগনচন্দ্র হোম প্রভৃতির সাথে নরেন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে।

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল তখন নববিধান ব্রাহ্মসমাজের 'গায়কাচার্য' পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেজন্য তাঁকে বলা হত 'The singing Apostle of New Dispensation Church.' কুঞ্জবিহারী দেব এবং উমানাথ গুপ্ত এঁরা দুজনেও ছিলেন নববিধানের গায়ক ও গান রচয়িতা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গেও নরেন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে এই সময়ে। রবীন্দ্রনাথের রচিত ও সুর সংযোজিত গান নরেন্দ্রনাথ গাইতেন। রাজনারায়ণ বসুর কন্যার বিবাহ-বাসরে তাঁর গান গাইলেন নরেন্দ্রনাথ। গানটি হল—

'দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিত যদি,
বল দেব, কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়।'

কবি নিজেই এ গানটিতে সুর যোজনা করেছিলেন

বলে জানা যায়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র দীপেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রর সহপাঠী, ঠাকুর বাড়িতে নরেন্দ্রনাথ গেলে তাঁর স্কটিশচার্চের সহপাঠী দীপেন্দ্রনাথ—'কে হে নরেন?' বলে ছুটে এসে দেখা করতেন। এমনই ছিল তাদের হৃদ্যতা ও ভালবাসা।

পাঠদশায় নরেন্দ্রনাথকে—ব্রাহ্মসমাজের গানগুলি সর্বদাই উদ্বুদ্ধ করে রাখত। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'অনুপম মহিমাপূর্ণ ব্রহ্ম কর ধ্যান', রবীন্দ্রনাথের 'মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতা', বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় রচিত 'অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি', রবীন্দ্রনাথের '(তাঁরে) আরতি করে চন্দ্র-তপন, দেব মানব বন্দে চরণ'—এসব গান নরেন্দ্রনাথ প্রায়ই গেয়ে থাকে।

(৪৭)

নীরব সাধনা

তবে নরেন্দ্রনাথ শুধু যে সঙ্গীতচর্চা করেন তাই নয়। সঙ্গে চলে পড়াশোনাও। কিন্তু তার চেয়েও গভীর এক ধর্মভাব তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। সেই ধর্মভাবের তীব্রপ্রেরণায় অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালনে ও কঠোর তপস্যায় নরেন্দ্রনাথ দিন কাটায়। মাসের পর মাস সে নিরামিষ ভোজে কাটায়। ভূমি অথবা কম্বলশয্যায় রাত্রিযাপন করে। সিমলায় তাদের বাড়ীর কাছেই তার মাতামহীর একটি ভাড়াটে বাড়ী আছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর থেকে ঐ বাড়ীর ছাতের উপর বাইরের দিকে দ্বিতলের একটি ঘরে সে বাস করে। এও যেন এক তপস্যা, নির্জন বাস, আত্মীয় স্বজন, পরিবার বর্গ থেকে দূরে পৃথকভাবে থাকার মধ্যে দিয়ে সে যেন এক সাধনায় মজে আছে। বাড়ীতে তার বাবা ও সকলে ভাবে বাড়ীতে নানা গণ্ডগোলের মধ্যে বোধ হয় তার পড়াশোনা হয় না। তাই সে পাঠাভ্যাসের সুবিধার জন্য পৃথক থাকে। কিন্তু নরেন্দ্র যে গোপন সাধনায় নিমগ্ন আছে, সেকথা কেউ জানত না।

প্রতিরাত্রে শুলেই দুই কল্পনা নরেনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, একটায় সে দেখে অশেষ ধন-জন-সম্পদ ঐশ্বর্য লাভ করেছে। সংসারে যারা ধনী বলে পরিচিত, তাদের মধ্যে সে সেরা হয়েছে। আবার পরক্ষণেই সে দেখে, সে যেন পৃথিবীর সর্বস্ব ত্যাগ করে একমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে কেবলমাত্র কৌপীনমাত্র সম্বল করে গৃহত্যাগ করেছে। এখন তার ভোজন—যতটুকু পায় খায়, বৃক্ষ তলে রাত্রিযাপন করে। এ অবস্থায় নরেন্দ্রর মনে হয় যে যেন ঐভাবে মুনিঋষিদের মত জীবনযাপনে সমর্থ। অবশেষে দুটি কল্পনার মধ্যে পরেরটিই তার হৃদয় মন সমগ্র সত্তাকে অধিকার করে নিল; নরেন্দ্র বুঝল যে একমাত্র ঐভাবেই পরমানন্দ লাভ করা সম্ভব এবং মনে মনে একপ্রকার স্থির করে নিল যে সে ঐরূপই করবে। এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবনটির কথা কল্পনা করতে করতে নরেনের মন নিমগ্ন হয় ঈশ্বরচিন্তায়। ঈশ্বরচিন্তায় নিবিষ্ট থেকে একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ে। (ক্রমশঃ)

সুকুমার দাস

আমরা তো মানুষ
নই তো আমরা মেষ,
আমাদের আছে বুদ্ধি-বিবেক
তবু আমাদের মনে বিদ্বেষ।

"হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'
মানুষে মানুষে হানাহানি,
জাত-ধর্ম-সম্প্রদায় নিয়ে
চলছে এখন টানাটানি।

যাদব কুলের উন্মত্ততা
রচেছে তাদের ধ্বংস কাহিনী,
যারা হানাহানি করে
তারা কী একথা শোনেনি?

মানুষের উপর আছে বিশ্বাস
বিশ্বাস হারানো পাপ,
একদিন মানুষ বুঝবেই
করবে সেদিন অনুতাপ।

আমরা তো মানুষ,
আমাদের আছে মান-সম্মান,
একদিন বিবেক জাগলেই
করবে না কারে অপমান।

—০—

'যত মত তত পথ'—ঠাকুরের এক অনির্বচনীয় বাণী

শ্রীমতী কেকা চট্টোপাধ্যায়

ধর্ম পরায়ণ, ভক্তবৎসল, সত্যনিষ্ঠ অন্তর যা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও নির্ভরতায় পূর্ণ ৺রঘুবীরের হস্তে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পিত ব্যক্তিত্ব শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অতীব ধর্মপরায়ণা সহধর্মিণী কোমল স্বভাব স্নেহ সরলতার প্রতিমূর্তি দয়া ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ মাতৃমূর্তি সকলেরই পরিচিত নাম শ্রীমতী চন্দ্রামণি দেবী। তাঁদের ঘরে যে ঈশ্বরের অনুপ্রবেশ ঘটবে এটা ত স্বাভাবিক। এবার ঠাকুরের ১৮৫ তম শুভ আবির্ভাব তিথি। ১৮৩৬ খ্রীঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে পরম ভক্ত ক্ষুদিরাম আর সরলতার প্রতীক চন্দ্রমণি দেবীর ঘর আলো করে অখ্যাত পল্লীগ্রাম কামারপুকুরে জন্মগ্রহণ করলেন অবতার রূপে অন্যায়ের প্রতিকার করতে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। গীতাতে আছে—যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।

ঠাকুর পরমহংসদেবের আবির্ভাব ও অবস্থান এমনই সময়ে হয়েছিল যখন তিনি সাধারণ মানুষকে চৈতন্য লোকের খবর দিয়েছিলেন। তিনি সকলের সুখ সমৃদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের চিন্তায় নিজেকে সর্বদা নিয়োজিত রাখতেন। তাঁর পীঠস্থান দক্ষিণেশ্বর মন্দিরকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথের মধ্য দিয়ে যে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় তা তিনি আমাদের দেখিয়ে দিলেন। তিনি বললেন 'যত মত তত পথ' এই অনির্বচনীয় বাণী। ঈশ্বরকে পেতে গেলে চাই শুধু আন্তরিকতা আর ব্যাকুলতা। তিনি আমাদের বোঝালেন ধর্ম হচ্ছে অন্তরের বিষয়। তাকে ঠিক ঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে হয়। তিনি যে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ প্রদর্শক। কারণ তাঁর মুখ নিঃসৃত 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা'। এই শিবজ্ঞানে জীবসেবা আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু করেছিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দজী সারগাছির মহুলা গ্রামে মাত্র চার আনা সম্বল করে যা পরবর্তীকালে ব্যাপকতর রূপ নিয়েছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের নিজেদের জীবন দিয়ে বুঝিয়েছেন প্রতিটি ধর্মের উৎস যেখান থেকেই হোক না কেন তা এক জায়গাতেই গিয়ে মিলিত হয়। ঠাকুরেরই উপমা জলকে কেউ বলে জল কেউ বলে পানি আবার কেউ বলে ওয়াটার। কিন্তু সবার একই অর্থ বোঝায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, আসক্তি শূন্য হয়ে কর্ম করতে হবে। ঈশ্বর দর্শন করতে গেলে কামগন্ধহীন অনুরাগ চাই। অর্থাৎ কামিনী কাঞ্চনে মন থাকলে তাঁর উপর অনুরাগ আসে না। জীবন ব্যাপী সাধনায় ডুবে থাকতে হবে। তাই ঈশ্বরীয় পথের সাধনা এতেই সমৃদ্ধ হয়। ঠাকুরের মতে তখনই ঈশ্বরের সৃষ্টির উপর অনুরাগ আসবে। একমাত্র প্রেমের বা ভালবাসার চক্ষুতেই এঁকে অনুভব করা যায়। ঠাকুরের কথামৃত রূপ অমৃতের মধ্য দিয়ে আমরা জানতে বা বুঝতে পারছি যে আন্তরিক যদি আমরা হই তাহলে সব রকম ধর্মকে আমরা শ্রদ্ধা করতে পারি, জানতে পারি। তাঁর কথামৃত পান করলে আমাদের জীবনে নব সূর্যোদয় হবে। ধর্মে ধর্মে যে অসহিষ্ণুতা তা কেটে যাবে। যাঁর মধ্যে অমৃত সত্য লুকিয়ে আছে সেই ঠাকুরের পাদপদ্মে আমরা স্থান পাব। ঠাকুরের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক অমৃতে আমাদের মন ভরে উঠবে। কালের ব্যাবধানকে পরাস্ত করে সবাই আমরা আনন্দে সামিল হচ্ছি তাঁরই আনন্দ বিতরিত জন্মোৎসবের মধ্য দিয়ে। তিনি বলছেন, শরণাগত হও আর সত্যকে প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরে থাক। তিনি সত্যকে জীবনে সবার উপর স্থান দিয়েছেন। বিবেকানন্দ বলেছেন 'সত্যের জন্য সবকিছু ত্যাগ যায়, কিন্তু কোন কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ যায় না।' এই কথাটিও শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্ভূত। এত সহজ করে ধর্মের ও আধ্যাত্মিকতার ব্যাখ্যা ঠাকুর যে ভাবে আমাদের দিয়েছেন তাঁরই হাত ধরে আমরা নব জাগরণের নব সূর্যোদয় দেখব। তাই তিনি চিরকাল আমাদের সকলের কাছে ঘরে ঘরে সমাদৃত হয়ে আসছেন এবং ভবিষ্যতে সমানভাবে আদৃত হয়ে থাকবেন এ আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। ❑

'বকলমা' মানে—মনে মনে ভগবানকে সমস্ত ভার অর্পণ করা। বকলমা দেওয়ার পরেও ইষ্ট মন্ত্র জপ, কিংবা দিনান্তেও ভগবানকে একবার স্মরণ করতে হয়। একেবারে বাসনাশূন্য হয় দু'একটি। যদি নির্বাসনা হতে পার, এখুনি হয়। যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই। ওসব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন।

—শ্রীমা সারদাদেবী

"বিজ্ঞান জগৎ এবং আধ্যাত্মিক জগৎ"

সারদা বালা দাসী

সর্বশক্তিমান শ্রী ভগবানের সৃষ্ট প্রধানতঃ দুটি জগৎ। প্রথমটি পার্থিব জগৎ (Secular World) বা সাংসারিক জগৎ, জড় জগৎ বা বাহ্যিক জগৎ। অন্যটি আধ্যাত্মিক জগৎ (Celestial World) বা অন্তর্জগৎ। আমরা প্রথম এই পার্থিব জগৎ বিষয়ে মোটামুটি জানব। এই বহির্জগতে অনেক বিষয় সম্বন্ধে জানতে পারি এজন্য আমরা বিশেষ করে বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী কারণ বিজ্ঞান আমাদের জাগতিক বহু সুযোগ, সুবিধা, আরাম এনে দেয় এমন কি আজ বিজ্ঞানের কল্যাণে বিভিন্ন যন্ত্রে যেমন— মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ল্যাপ্‌টপ্ এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীকে প্রায় মুষ্টিবদ্ধ করে ফেলেছি। পরে দেখব জড় জগৎ বলে কিছু নেই। সবই চেতন, চৈতন্যময়।

আপাতত এই জড় জগতের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য হচ্ছে -আরামে, ভোগ-বিলাসে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া আর এজন্য আমাদের পড়তে হয় বিভিন্ন Subject যেমন পদার্থ বিদ্যা (Physics), রসায়ন (Chemistry), জীববিদ্যা (Biology) , ভূগোল (Geography), জ্যোতির্বিদ্যা (Astronomy), গণিত শাস্ত্র (Mathemeatics) ইত্যাদি। এই সব বিষয় জেনে উচ্চপদ প্রাপ্ত হওয়া অর্থাৎ Ph.D, F.R.C.S, M.R.C.P. ডিগ্রী (Degree) অর্জন করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা। এবার দেখব এই বিষয়গুলি আমাদের শেষ পর্যন্ত কতটা আনন্দ দিতে পারছে।

পদার্থ বিদ্যা (Physics)

এই বিষয়টির ব্যবহারিক ক্ষেত্রে (Practical Observation) এর সময় আমাদের যেসব যন্ত্রগুলি যেমন—মাইক্রোমিটার স্ক্রু, স্ক্রু-গেজ, ভার্নিয়ার স্কেল, এখন আরও সূক্ষ্ম অনেক যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়। এই যন্ত্রগুলি ব্যবহার করে আমরা যখন পাঠ (Reading) লিখি তখন চোখের ভুল (Eye-error) বলে একটি Column এ কিছু লিখতে হয় অর্থাৎ আমরা নির্ভুল দেখছি না আমরা Approximate (সাময়িক) কথাটি ব্যবহার করি। এবার দেখি আমরা যে অণু (Molecule), পরমাণু (Atom) ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন নামে কণাগুলির উল্লেখ করি এগুলি চোখে দেখা যায় না কিন্তু অস্তিত্ব আছে। এদের গুণগত প্রভাবে বুঝে নিতে হয়। যেমন উষ্ণতা, শীতলতা দর্শন করা যায় না অনুভবে বুঝতে হয়। যাইহোক এছাড়া পদার্থের অবিনশ্বরতা সূত্র (Law of Indestructibility of matter) তে বলা হচ্ছে সমস্ত পদার্থই অবিনশ্বর অর্থাৎ বিনাশ নেই। আবার বলা হচ্ছে জগতে সৃষ্ট পদার্থ দ্বারাই আমরা নূতন নূতন পদার্থ তৈরী করছি। আমরা নূতন কোন মূল পদার্থ সৃষ্টি করতে পারি না। যেমন—বাতাসে যে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড পাই এগুলিও আমরা তৈরি করিনি।

রসায়ণ (Chemistry)

এই বিষয়টিতে প্রধানতঃ এ্যাসিড এবং বিভিন্ন লবণ, ক্ষার, ক্ষারক ইত্যাদি বস্তু নিয়ে ব্যবহারিক বিক্রিয়া করা হয় এবং উৎপন্ন পদার্থের স্বাদ, বর্ণ, ঘনত্ব ইত্যাদি ব্যাখ্যা করতে হয়। এক্ষেত্রেও দেখা যায় আমরা কোনটিই ঠিকমত উল্লেখ করতে পারি না। বর্ণ বলতে গেলে আমরা বলি, সবুজ বা হালকা সবুজ। এখন এই সবুজ রংটি তৈরী হয় নীল, এবং হলুদ রঙের মিশ্রণে। এখানেও এ দুটি রঙের বিভিন্ন অনুপাত অনুযায়ী সবুজ রঙটিও বিভিন্ন রকম সবুজ হয়। স্বাদের ক্ষেত্রেও মিষ্টি, হালকামিষ্টি বা কড়ামিষ্টি বলি এর মধ্যবর্তী আস্বাদগুলি বলতে পারি না।

প্রাণী বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা (Biology)

এই বিষয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখা যায় এমন এক শ্রেণীর পদার্থ বা বস্তু যেটাকে আমরা ব্যাখ্যা করতে ধাঁধায় পড়ে যাই যে, বস্তুটি প্রাণী কি উদ্ভিদ শ্রেণীভুক্ত যেমন শ্যাওলা।

ভূগোল (Geography)

প্রাথমিক ভাবে আমরা জেনেছিলাম পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান এবং সূর্য স্থির হয়ে নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করছে। বর্তমান উন্নত বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে সূর্য ও ঘূর্ণায়মান তবে পৃথিবীর তুলনায় অতি—সামান্য গতিবেগে। আবার মহাকাশে গ্রহের সংখ্যা প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিলো নয়টি। বর্তমানে সংখ্যাটি বেড়ে বারো (১২) টিতে দাঁড়িয়েছে, ভৌগোলিক বিচারে ঋতুগুলি মাস অনুযায়ী বিভক্ত ছিলো এখন সেটি আর ঐ নিয়ম মানছে না। অর্থাৎ আমরা এক আপাত সত্যের যুগে বাস করছি। চিরন্তন

সত্যকে জানতে পারছি না। অর্থাৎ আমরা ক্রমশঃ উচ্চতর সত্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

গণিত (Mathematic's)

এই বিষয়টিতে শূন্য (0) Zero, এর একটি রহস্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমরা সাধারণভাবে জানি শূন্য অর্থ 'কিছু না'। কথাটি কোন কোন ক্ষেত্রে সত্য নয়, যোগ, বিয়োগের ক্ষেত্রে সত্য ধরা হয় যেমন 9+0=9, 9–0=9. গুণ করার ক্ষেত্রে 9X0=0 অর্থাৎ এখানে এই শূন্য সংখ্যাটি অতি বৃহৎ সংখ্যাকে শূন্যে পরিণত করে। কিন্তু ভাগের ক্ষেত্রে $\frac{9}{0} = \alpha$ (অসীম) অর্থাৎ আজও বিজ্ঞান এই শূন্যের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে নি। দুটি সমান্তরাল সরলরেখাও অসীমে বিলীন হয়ে যায় শূন্য কে নিয়েই মহাবিস্ময়। এই অসীমকে জানাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য ।

দর্শন-শাস্ত্র (Philosophy)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে স্বামীজী কথামৃতকার মাষ্টার মশাই (তদানীন্তন) স্বনাম-ধন্য বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষক কে বলছেন—ফিলসফি (দর্শন) পড়া শেষ হলে মানুষটি একটি (Learned ignorant) পণ্ডিত-মূর্খ হয়ে দাঁড়ায়। একথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বলছেন—"Thank you" অর্থাৎ কথাটি সত্য। এরপর সে ব্যক্তি ধর্ম ধর্ম করে। দর্শন শাস্ত্র স্বামীজীকে বোঝাতে পারেন নি Prof. William স্বামীজীকে এই শাস্ত্রটি বুঝবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট পাঠিয়েছিলেন। এই ঠাকুর-ই স্বামীজীকে প্রকৃত দর্শন বুঝিয়েছিলেন। পরে একদিন নরেন্দ্র একজন ডাক্তারকে বলেছিলেন—Scientific discovery (জড়বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কার) এর আপনি (Life devote) জীবন দিতে পারেন শরীর, রোগ ইত্যাদি কিছুই গ্রাহ্য করেন না। আর ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান (Grandest of all Science) আত্মতত্ত্ব জানা এই পরম সত্য সকলকে বোঝাবার জন্য শরীর নষ্ট হয় এরূপ মনের ভাব করবেন না? তিনি এমন ঐশ্বরীয় ভাবে ঊর্ধ্বে বিচরণ করতেন, যে বলতেন—বড় বড় পণ্ডিত গুলোকে সব খড়কুটো বোধ হয়। কেঁচোর মত তারা ঠাকুরের কাছে থাকতেন।

বৈজ্ঞানিক স্যার আইজ্যাক নিউটন যে মাধ্যাকর্ষণ এবং মহাকর্ষ শক্তি আবিষ্কার করেছিলেন এই মহাকর্ষ শক্তি তো পৃথিবীতেই ছিল সেই সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই। ইনি সেই শক্তিটাকে উপরের আবরণটা সরিয়ে উন্মোচন করলেন মাত্র। এ জন্য বলা হচ্ছে Discover করলেন। যেটি ছিলো না এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্যে তৈরী হল সেটা Invention যেমন—গ্যালিলিও টেলিস্কোপ যন্ত্রটি সৃষ্টি করেছিলেন। সেজন্য বৈজ্ঞানিক বিদ্যারও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। যার ফলে আজ আমরা বিভিন্ন ভাবে জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য পাচ্ছি। এই স্বাচ্ছন্দ্যের ফলে আমাদের Horizontal Growth হচ্ছে বাড়ী ঘর, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মঠ, মন্দির ইত্যাদি। Vertical Growth ও হচ্ছে আমরা বহুতল বিল্ডিং বানিয়ে বহু উচ্চে বিচরণ করছি এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন—আমাদের মানসিকতার Vertical Growth বাড়িয়ে আমরাও বহু উচ্চে চিরন্তন আনন্দের অধিকারী হয়ে পরমানন্দে থাকতে পারি। জাগতিক জগতে আমরা যে আনন্দ পাই সেটা ক্ষণিক, অস্থায়ী কারণ আমরা প্রথমে এক (১) কে অর্থাৎ ঈশ্বরকে স্রষ্টার আসনে না, বসিয়ে নিজেরাই স্রষ্টার দাবী করছি। এজন্য সবই শূন্যে দাঁড়াচ্ছে অর্থাৎ ০০০০—মহাশূন্যের প্রকৃত অর্থ বুঝে অগ্রসর হওয়া এবং এই পরম প্রাপ্তির পর অন্যকেও এই পরমানন্দের অংশীদার করা। অর্থাৎ যেমন একটি প্রজ্বলিত মোমবাতি বহু বাতিকে সমুজ্জ্বল করতে পারে সেজন্য আমাদের মধ্যেও যে মহাশক্তি লীন হয়ে আছে তার আবরণটা সরিয়ে Discover করতে হবে এই আত্মাকে এই অনন্ত শক্তিকে।

স্বামীজী তাঁর বাণীতে বলছেন—"আপনার যদি কিছুমাত্র বিদ্যা না থাকে সে ভালো কথা, আর আপনি যদি সারাজীবনে একখানি পুস্তকও না পড়িয়া থাকেন সে আরও উত্তম কারণ এগুলি আমাদের 'মুক্তি দিতে বা আত্ম-তত্ত্ব জানতে বিন্দুমাত্রও সাহায্য করে না। শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন—"একটা ঔষধ পেলে বাঁচতাম যাতে এ পর্যন্ত যা জেনেছি সব ভুলে যেতাম।" ভগবান আমাদের ইন্দ্রিয় গুলিকে বহির্মুখ এবং সীমিত ক্ষমতা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন সে অসীমের ধারণা করতে আমাদের বহু সাধনার প্রয়োজন। তাঁর কৃপায় অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচন হলে

দেখতে পাব জগৎ বলে কিছু নেই ‘আমি’ নামক শরীরটিও নেই। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ, ঋষি এবং অবতারগণের অনুভবে এটি প্রকটিত হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—এক জ্ঞান-ই জ্ঞান, এই এক জ্ঞান হচ্ছে ঈশ্বর বা ‘আমি’ কে জানা। আমরা আমাদের প্রকৃত নাম রূপ বাসস্থান আমাদের পিতা মাতা সবই ভুলে গেছি। আমাদের পরিচয় Identity (I.D.) আমাদের নাম ব্রহ্ম (জীব ব্রহ্মৈব ন, অপরাঃ) আমাদের রূপ---সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। বাসস্থান—চিন্ময় ধাম। আমাদের পরমপিতা—জগৎ পিতা এবং মাতা— জগৎ-জননী। এটি ঠিক ঠিক অনুভব হলে “স্বামীজী রচিত প্রার্থনা খণ্ডন ভববন্ধন..... অর্থাৎ আমাদের জীবন চক্রের বন্ধন, খণ্ডন হয়ে গেছে বুঝতে পারব। তাঁর রচিত এই সঙ্গীতটির দ্বারা তিনি আরও স্বচ্ছভাবে এটি ব্যক্ত করেছেন—

নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর।।
অস্ফুট মন-আকাশে জগৎ সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডুবে পুনঃ; অহং-স্রোতে নিরন্তর।।
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র ‘আমি’ ‘আমি’—এই ধারা অনুক্ষণ।।
সে ধারাও বদ্ধ হলো শূন্যে শূন্য মিলাইল,
অবাঙ-মনসগোচরম্ বোঝে প্রাণ বোঝে যার।।

শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু

“নববর্ষের আহ্বান”

শ্যামাপ্রসাদ কুমার

পুরাতনকে হারাবার কঠিনতম জ্বালায়.....
যখন বিষণ্ণতা আচ্ছন্ন করে....
বিদীর্ণ করে আপন আপন অন্তরকে....
ঠিক তখনি নবকুমারের পারের দিশা আন্দোলিত করে....
মসিময়; খানিকটা আধপোড়া রুটির শরীরের মত মনটাকে
নূতনের আগমনের বার্তায়......
নববর্ষের প্রথম দিনটির ঘোষণা....
যেন দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পরীক্ষার ফলাফলে
প্রথম হওয়ার ঘোষকের ঘোষণা....
একদিকে জীর্ণ.... পুরাতন... পত্র স্খলন
অন্যদিকে যেন বর্ষার সূচনায়
নব পল্লবের সংযোজন....
সমস্ত দুঃখ-আনন্দ-হর্ষ-মিলেমিশে
এক দুর্বার আনন্দের শুভ উন্মোচন।
তাই, যা যাওয়ার ছিল..... তা যাক.....
এখন এস সবে করি আহ্বান
নববর্ষের শুভক্ষণে নূতনের মঙ্গলারতি....
প্রার্থনা করি সেই সর্বশক্তির অধীশ্বরের নিকট
দাও শুভবুদ্ধি... উদিত হউক শুভশক্তি
ফল হউক শুভ.... শুভ..... শান্তি.... শান্তি।।

—০—

অরুণ শীল

“জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।”
বিবেক স্বামীর এই মহান বাণীটিকে নিজের জীবনে তুলেধর।।
শত মন্দিরে কত দেবতার পূজা তো করিলি হেথা,
ঘুচিল কি দুখ পাইলি কি সুখ দেবতা শুনিল কি তোর কথা ?
তিনি নাই আজি কোন মন্দিরে আছেন প্রতিটি জীবে,
সকল জীবের হৃদয়ে তিনি যে তাঁহারে চিনিতে হবে।।
তাই স্বামী কন সবে প্রেম কর ভালবাস সব জীবে,
তাহলেই হবে দেবতার পূজা পূজা হবে তোর শিবে।।
অভুক্ত জীবেরে খাবার দিবি রে নিরাশ্রয়ে দিবি ঠাঁই,
তবেই দেখিবি দেবতা হাসিছে তোর মনে আর দুঃখ নাই।।
বৃথা উপবাসি হয়ে তুই ওরে ফুল দিস যত দেবতার গৃহে,
শুভ কিছু নাই সে অর্চনায় সুখ নাই তার ফল পেয়ে।।
যাহা কিছু শুভ যাহা কিছু ভাল সবই জীবের প্রেমে,
নইলে দেখিবি ব্যর্থ জীবন ভালো সব গেছে থেমে।।
জীবে প্রেম দানি সফল কর গো তোমার জীবনখানি,
পুণ্যকর্ম সেটাই এখন বলেছেন সবে বিবেকস্বামী।। ❑

লোকের কথায় কান না দিয়ে ঠিক ঠিক চলবার চেষ্টা করবে। দেখবে অন্তে ঠিক সেই জ্যোতির্ময়ধাম রামকৃষ্ণলোক মিলে যাবে। —শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব

শ্রীবৈকুণ্ঠ

পাঁচশো বছর আগের কথা। পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে এসে শ্রীচৈতন্যদেব মহাপ্রভু গোয়ালন্দের কাছে পদ্মানদীর তীরে অবস্থিত কোমরপুর গ্রামে উপনীত হয়ে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন ধর্মনিষ্ঠ পণ্ডিত বাসুদেব চক্রবর্তীর বাড়ীতে। শ্রীচৈতন্য চরণচিহ্নিত সেই কোমরপুর গ্রাম পরবর্তীকালে পদ্মানদী গর্ভে বিলীন হলে ঐ চক্রবর্তী পরিবার আশ্রয় নিয়েছিলেন গোবিন্দপুর গ্রামে। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত দীননাথ ন্যায়রত্ন ছিলেন এই পরিবারের একজন। অধ্যাপক বৃত্তি নিয়ে তিনি এক সময় কর্মোপলক্ষে এসে উপস্থিত হন নতুন বাসস্থান মুর্শিদাবাদের ডাহাপাড়াতে।

পণ্ডিত দীননাথ যেমন ছিলেন একজন পরম ভাগবত, তেমনই তাঁর সহধর্মিনী বামাদেবীও ছিলেন ভক্তির প্রতিমূর্তি। প্রাচীন কুলদেবতা শ্রীরাধাগোবিন্দের বিগ্রহ সেবায় আত্মনিবেদন করে এই ভক্তদম্পতি কালযাপন করতেন। বাংলা ১২৭৮ সালের ১৫ই বৈশাখ, ইং ১৮৭১ সালের ২৮শে এপ্রিল তারিখে সীতানবমী তিথিতে শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে এঁদেরই শ্রীমণ্ডিত সংসারে এসে আবির্ভূত হন প্রভু জগবন্ধুসুন্দর।

প্রভু জগবন্ধুর আবির্ভাবের আগে মাতা বামাদেবী একদিন স্বপ্নে দেখেন জ্যোতির্ময় একজন পুরুষ এসে তাঁকে বলছেন, "সংসারটা অধর্মে পরিপূর্ণ; হলো। আমি শীঘ্রই হরিনাম প্রচার করার জন্যে তোর কাছে আসবো।"

প্রভুর জন্মকাহিনীও যথেষ্ট রহস্যাবৃত। ১৮৯১ সালে ডাহাপাড়ার বেলতলায় ভট্টাচার্যদের বাগানে একদিন সকাল বেলায় প্রভু তাঁর অন্তরঙ্গ আশ্রিত চম্পটি ঠাকুরকে ডেকে বললেন, "আমি অযোনীসম্ভব। আজ তোকে আমার জন্ম রহস্য বলবো। আমার জন্মস্থান ডাহাপাড়ার প্যালেসের ওপারে। রাজধানী ভিন্ন অবতারের জন্ম হয় না। পরিখা বেষ্টিত রীতিমত রাজ প্রাসাদ। বঙ্গাধিকারীর দ্বার পণ্ডিত ছিলেন দীননাথ ন্যায়রত্ন। তাঁর একটি চতুষ্পাঠীও ছিল। তিনি ও তাঁর ব্রাহ্মণী একদিন সীতানবমী তিথিতে অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে বঙ্গাধিকারীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যান। ফিরেএসে দেখেন, জ্যোতির্ময় গৃহ আলোতে উদ্ভাসিত। ঘরের মধ্যে সদ্যোজাত অপূর্ব শিশু বর্তমান। ন্যায়রত্ন ও ব্রাহ্মণী দুজনেই স্তম্ভিত। অবশ্য ইতিপূর্বে ব্রাহ্মণীর গর্ভাভাসের লক্ষণ ছিল। তাই লোকে জানলো ব্রাহ্মণী এক পুত্র সন্তান প্রসব করেছে। কিন্তু উভয়ে এ গুহ্য কথা কারও কাছে কখনো প্রকাশ করেনি।

প্রভু জগবন্ধুর শিশুকালেই একসময় মহারাণী স্বর্ণময়ীর কাছে নেপাল থেকে এক সন্ন্যাসী জ্যোতিষীর আগমন হয়। প্রভুর ঠিকুজি তাঁকে দেখানো হলে অবাক বিস্ময়ে তিনি বলেন, "যে পাঁচটি গ্রহের সঞ্চারে ও সংযোগে অবতারের জন্ম হয়, সেই পাঁচটি গ্রহই এই জাতকের জন্ম লগ্নে তুঙ্গে অবস্থিত। ইনি দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষ হবেন। এঁর আবির্ভাবে জীব কৃতার্থ হয়েছে।"

পরবর্তীকালে আশ্রিত কোন কোন ভক্তকে প্রভু তাঁর জন্ম রহস্য কিছু কিছু প্রকাশ করেন। তার মধ্যে দুঃখীরাম ঘোষকে এক সময় পত্রে তাঁকে লেখেন, "দিনু (দীননাথ ন্যায়রত্ন) ও গোপাল (জেঠতুতো দাদা) ঠাকুরেরা আমার কেউ নয়। আমি তাদের পোষ্যমাত্র। চন্দ্রের সুধায় আমার কারণ দেহ। যোনী সংস্রব নাই। আমি কৃষ্ণ বিষ্ণু সব নিত্য জেনো।"

জগবন্ধু সুন্দরের মাত্র দেড় বছর বয়সে মাতৃ বিয়োগ হলে তাঁকে নিয়ে আসা হয় গোবিন্দপুরে জেঠিমা রাসমণি দেবীর কাছে। তাঁর তিন বছর বয়সে রাসমণি দেবীও লোকান্তরিত হন। এরপর শিশু জগবন্ধুর লালন পালনের ভার স্বহস্তে তুলে লেন রাসমণি দেবীর কন্যা, প্রভুর জ্যেঠতুতো দিদি বাল বিধবা দিগম্বরী দেবী।

শিশুকালেই বন্ধুসুন্দর হরিনাম শোনার জন্য কান্নাকাটি করতেন, কিংবা অন্য সময় ক্রন্দনরত তাঁর কাছে 'হরিবোল হরিবোল' বললে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চুপ করে যেতেন। আধো আধো স্বরে 'জগা মাধা দুভাই ছিল, তারা হরিনামে তরে গেল' গানটি গাইতে গাইতে তিনি ঘুরে বেড়াতেন এদিকে সেদিকে। আবার কখনো কখনো মুড়ি খাওয়ার বাটিতে নারায়ণ শীলা বসিয়ে তার সামনে নৃত্য করতেন।

১২৮৫ সালে প্রভুর মাত্র সাত বছর বয়সে দীননাথ ন্যায়রত্ন পরলোক গমন করলে তাঁরা ব্রাহ্মণ কান্দায় চলে আসেন। দিগম্বরীদেবীর সম্পর্কিত বোন নিস্তারিণী দেবী এ

সময়ে মাঝে মাঝে ব্রাহ্মণকান্দায় আসতেন। তাঁকে বন্ধু সুন্দর একদিন বলেন "আমিই গৌরাঙ্গ"।

নিস্তারিণী দেবী 'বিশ্বাস হয় না' একথা বলায় তিনি বলেন, "পরে জানতে পারবি"।

গৌরাঙ্গদেব ও প্রভুর জন্মকোটিতে বহুবিধ মিল যথেষ্টই ছিল।

ব্রাহ্মনকান্দার ঈশ্বর মাস্টার মহাশয়ের পাঠশালা, কুষ্টিয়া আলমপুরের একটি স্কুল এবং ফরিদপুরের বাংলা স্কুলে কিছুদিন পড়ার পর প্রভু জগবন্ধু ভর্তি হয়েছিলেন ফরিদপুর জেলা স্কুলে। স্কুলে পাঠ্যাবস্থা থেকেই প্রভু ছিলেন সুবিনয়ী, নৈষ্ঠিক ও স্বল্পভাষী। তুলসী, দেবমন্দির, ব্রাহ্মণ ও সাধুসন্ন্যাসীদের দেখে প্রণাম করা ছিল তাঁর স্বাভাবিক অভ্যাস, ১৩ বছর বয়সে উপনয়ন সংস্কারের পর ত্রিস্নান, আহ্নিক কৃত্য, সংযম ও ব্রহ্মচর্য সাধনে তিনি ছিলেন কঠোর। জেলা স্কুলে যখন তিনি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র সে সময়ে মাঝে মাঝে প্রভু মৌন অবস্থায়, কখনো বা ধ্যানে মগ্ন থাকতেন।

বস্ত্র নিয়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে রাখার একাট প্রবণতাও এই সময় থেকেই দেখা গিয়েছিল তাঁর স্বভাবে।

অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় বার্ষিক পরীক্ষার দিন খাতার সামনে জগবন্ধুসুন্দরকে নির্বিকার উদাস নয়নে বসে থাকতে দেখে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের ধারণা হয়, তাঁর ঐ ছাত্রটি কোনো অসদুপায় অবলম্বনের অপেক্ষায় আছে। তখুনি তিনি বন্ধুসুন্দরকে পরীক্ষার খাতা ফেলে উঠে যেতে বলেন। মানসিক ভাবে মর্মান্তিক এই আঘাত পেয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে প্রভু ফরিদপুর শহর ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত হেঁটে অবশেষে ট্রেন ধরে চলে আসেন কলকাতায়। পরে ফরিদপুরে ফিরে গিয়ে ঐ প্রধান শিক্ষকের শত অনুরোধেও তিনি আর ঐ স্কুলে ফিরে যাননি।

১৮৮৮ সালে প্রভু জগবন্ধু কিছুদিন রাঁচীতে অবস্থান করেন। ওখানকার স্কুলে ভর্তি হয়ে তিনি নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। রাঁচী থেকে আবার ফরিদপুরে ফিরে এলে তাঁকে পাঠানো হয় পাবনাতে। দিগম্বরী দেবীর বোন গোলোক মণি দেবীর বাড়িতে। ১৮৮৯ সালে পাবনা জেলা স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে প্রভু জগবন্ধু সেখানে ১৮৯০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত পড়াশুনা করেন।

পাবনায় অবস্থান কালে বন্ধুসুন্দরের সাত্ত্বিকভাব বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। হরিনাম কীর্তনের আসরে তাঁর ভাবদশা, সমাধি, আবেশ, মুর্ছা, অশ্রু, কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার দেখা যায়। কখনো বা তিনি দিবারাত্র অচৈতন্য হয়ে থাকেন। ভাবাবিষ্ট অবস্থায় 'রাধা' নাম শ্রবণে প্রভুর মহাভাবদশা পরিলক্ষিত হয়। শোনা যায়, শ্রীগৌরাঙ্গদেবও 'রা' শব্দ উচ্চারণের পর 'ধা' বলতেই ঢলে পড়তেন। প্রভু জগবন্ধুও রাধানাম একেবারেই উচ্চারণ করতে পারতেন না। রাধারাণীকে তিনি 'শ্রীমতী' কিংবা 'বৃষভানুনন্দিনী' বলেই উল্লেখ করতেন।

বন্ধুসুন্দরের অপূর্ব ভাবরাশি ও দিব্য লক্ষণাদি দেখে পাবনার অনেকেই তাঁর প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন। শিবভক্ত শ্রীশ লাহিড়ী ও তাঁর সহধর্মিনী তাঁকে শিবজ্ঞান করে সোনার তারে গ্রথিত তিন লহড়ী একটি রুদ্রাক্ষের মালা অর্পণ করে ধন্য হন। পদ্মাসনে উপবিষ্ট প্রভুর আলোকচিত্রে ঐ মালাটি আজও দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ আলোকচিত্রটি তোলা হয়েছিল ১৮৯১ সালে কলকাতার 'বেঙ্গল ফটোগ্রাফার' দোকানে। প্রভুর বাল্য বন্ধু বকু বিশ্বাসই প্রভুকে কলকাতায় এনে ছবি তোলার ব্যবস্থা করেন, বকু বিশ্বাস তখন কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্র। পরবর্তী জীবনে তিনি মুন্সেফ থেকে সাবজজ্ ও জজ্ হন। প্রভুর উপদেশ মত ব্রহ্মচর্য ও হরিনাম গ্রহণ করে তিনি জীবনকে প্রভুত উন্নত করেন। তাঁর জীবনের সমৃদ্ধি, শ্রেয় ও কল্যাণ, এ সমস্তই যে বাল্যবন্ধু জগবন্ধুর দান, সে কথা তিনি সবসময় প্রচার করতেন। শেষ জীবনে হরিনাম উচ্চারণ করতে করতেই বকু বিশ্বাস একদিন স্বধামে গমন করেন।

লাহিড়ী দম্পতির আতিথ্যে প্রভু জগবন্ধু কিছুদিন তাঁদের ভবনে অবস্থান করেন। ঐ সময় তাড়াসের জমিদার রাজর্ষি বনমালী রায়, তাঁর গুরুপুত্র রঘুনন্দন গোস্বামী, শান্তিপুরের আনন্দ মৈত্র প্রমুখ বিশিষ্ট ভক্তজন তাঁকে সাক্ষাৎ গৌর জ্ঞানে প্রভু রূপে গ্রহণ করেন। বন্ধু সুন্দর কিন্তু কাউকে কখনো মন্ত্রদীক্ষা দিতেন না সর্বসমক্ষে নিজেকে তিনি চিরগুরু বলে পরিচয় দিতেন। ব্যবহারিক ভাবে শিষ্য গ্রহণ করা তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। বলতেন, "মানুষ-গুরু

মন্ত্র দেয় কানে, জগদগুরু মন্ত্র দেয় প্রাণে।"

পাবনা শহরের উপকণ্ঠে সর্পসঙ্কুল একটি পোড়ো বাড়ীতে দুর্গন্ধময় অন্ধকার অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে বাস করতেন উন্মাদ প্রায় এক বৃদ্ধা। লোকে তাঁকে ডাকতো হারান ক্ষেপা বলে। আসলে তিনি ছিলেন বাক্‌সিদ্ধ এক মহাপুরুষ। প্রায় দিনই দেখা যেতো, প্রভু জগবন্ধু, যিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদের গাত্রগন্ধেও অস্থির বোধ করতেন, তিনি ঐ হারানক্ষেপার ময়লা কাঁথার শয্যায় নির্বিকারে শুয়ে আছেন তাঁর পাশটিতেই। প্রভু হারান ক্ষেপাকে ডাকতেন "বুড়োশিব" বলে। বুড়োশিবও বন্ধুসুন্দরকে ভাল বাসতেন প্রাণাধিক।

ভক্ত বৈষ্ণব মহাজনেরা বুড়োশিবকে কেউ কেউ গৌরাঙ্গলীলার অদ্বৈতাচার্য বলেও মনে করতেন। হারানক্ষেপা স্থান ও কালের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন না। তালাবদ্ধ ঘরে তাঁকে আটক করেও দেখা যেতো তিনি বাহিরে নির্বিকার ভাবেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সর্বশেষ শোনা যায়, পাবনা ও সুলতানপুর, এই দুই জায়গাতেই তিনি দেহ রক্ষা করেছেন একই দিনে এবং দুই জায়গাতেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। অথচ আরও আশ্চর্যের কথা, কোনো কোনো ভক্ত আজও হারানক্ষেপার চাক্ষুষ দর্শন পেয়ে সিদ্ধান্ত করেন, তিনি আজও দেহে বিদ্যমান।

এ হেন হারানক্ষেপা প্রায়ই লোকেদের ডেকে বলতেন, " ওরে জগা (প্রভু জগবন্ধু) মানুষ নয় রে, সাক্ষাৎ...। ওকে তোরা যত্ন করিস। জগা গৌড় এর রাজা, আমরা সব প্রজা।"

বিদ্যালয় ত্যাগ করার পর প্রভু জগবন্ধু পাবনা, ব্রাহ্মণকান্দা, বাকচর, নবদ্বীপ, ডাহাপাড়া ঢাকা, কলকাতা, বৃন্দাবন প্রভৃতি জায়গায় মাঝে মাঝেই যাতায়াত করতেন। ব্রাহ্মণকান্দায় তিনি কীর্তনের সম্প্রদায় গঠন করেন। বাকচরের মহিম দাসজীর বাড়ীতে স্থাপিত হয় তাঁর প্রথম অঙ্গন। সেখানে চৈত্র মাসের বারুণী স্নানের দিন বন্ধুসুন্দরকে ঘিরে কীর্তনরত অবস্থায় ভাবের আতিশয্যে ভক্তপ্রবর মদন সাহা সমাধিস্থ হয়ে দেহ রক্ষা করেন।

১৩০০ সালে প্রভুর বাসের জন্য বাকচরে শীর্ণ স্রোতস্বিনী কাবেরীর তীরে বাকচর শ্রীঅঙ্গন স্থাপিত হয়। প্রভু স্বয়ং এখানে পঞ্চবটী স্থাপন করেন। বাকচরে অনেকগুলি কীর্তনের দলও গড়া হয়।

১৩০৪ সালে বাকচরে কয়েক মাস অনাবৃষ্টির ফলে শস্যের খুব ক্ষতি হয়। তার প্রতিকারে সপার্ষদ বন্ধু সুন্দর কীর্তন শুরু করার কিছু ক্ষণের মধ্যেই আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে মুষল ধারে বৃষ্টি নামে এবং অচিরেই মাঠঘাট জলমগ্ন হয়ে যায়।

বন্ধুসুন্দরের কীর্তনের কণ্ঠ ছিল যেমন মধুর, শ্রীখোল বা মৃদঙ্গে তাঁর হাতও ছিল তেমন দক্ষ ও পারদর্শী। সীতানাথ নামে একটি বৃহৎ মৃদঙ্গ বাজতো তাঁর হাতে। বড় বড় নগর সংকীর্তনে যোগ দিয়ে প্রভু ঐ সীতানাথ কাঁধে নিয়ে থাকতেন শোভাযাত্রার একেবারে সামনে। পথ দেখার জন্য একটি মাত্র চোখ অনাবৃত রেখে তাঁর বাকীদেহের সর্বাঙ্গ ঢাকা থাকতো চাদরে। এভাবেই তিনি সবসময় থাকতেন এবং তাঁর দিকে চেয়ে দেখতে নিষেধ করতেন সকলকে। প্রভুর বিশিষ্ট ভক্ত ও পার্ষদ রামদাস বাবাজী একবার শেষরাত্রে স্নানের সময় অসাবধানে তাঁর অঙ্গজ্যোতি দেখে 'বাপরে' বলে সঙ্গে সঙ্গে চোখ ঢেকে ফেলেন। এমনকি অপ্রকৃতিস্থ হন। পরে প্রভুর কৃপাতেই তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন।

ফরিদপুরের উপকণ্ঠে হিন্দু সমাজে উপেক্ষিত অবহেলিত অস্পৃশ্য এক জাতির বাস ছিল। লোকে তাদের বলতো 'বুনো বাগদী'। খৃষ্টধর্মী পাদ্রীরা একবার তাঁদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করে, অথচ তদানীন্তন হিন্দু সমাজপতিরা এ ব্যাপারে কোনো ভ্রুক্ষেপও করে না। প্রভুর প্রাণ কিন্তু কেঁদে ওঠে তাদের জন্য। দয়াল প্রভু তাদের ডেকে পাঠিয়ে কোলে টেনে নেন। বলেন, "আজ থেকে জেনো তোমরা কেউ হীন নও। তোমাদের অচ্যুৎ গোত্র।"

কৌলপন্থী রজনী বাগদী ছিল ওই বুনো বাগদীদের নেতা। বন্ধু সুন্দর তাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে হরিনাম মন্ত্র দিয়ে কীর্তনগানে উদ্বুদ্ধ করেন। কীর্তনীয়া রজনী বাগদীর নতুন নামকরণ হয় মহান্ত হরিদাস। হরিদাসের হাতের ও পায়ের আঙ্গুলে কুষ্ঠব্যাধি থাকায় প্রভু তাকে ক্যাম্বিসের একজোড়া নরম জুতা দানকরে আদেশ করেন ঐ জুতো পায়ে দিয়ে হরিনাম করল্যে তার কোনো অপরাধ হবে না। পরবর্তীকালে ঐ নামের প্রভাবে এবং জগবন্ধুসুন্দরের

কৃপায় হরিদাসের কুষ্ঠ ব্যাধির সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। তার স্বজাতি বুনো বাগদীরা সকলেই হরিনাম গানে উৎসাহিত হয়ে কীর্তনের দল গড়ে। হরিদাস মহান্তের নাম অনুসারে তাদের নাম হয় মহান্ত সম্প্রদায়। তাদের মধ্যে অনেকেই বিশিষ্ট কীর্তনীয়া ও মৃদঙ্গবাদকের মর্যাদা লাভ করে।

প্রভু জগবন্ধু মহান্ত সম্প্রদায়ের অস্পৃশ্য নাম মোচন করলেও তখনও কেউ কেউ তাদের অবজ্ঞার চোখে দেখতো। এরকমই একটি ঘটনা ঘটে নবদ্বীপের হরিসভায়। সেখানে বাকচরের ভক্তরা যখন পংক্তিতে বসে প্রসাদ গ্রহণ করছিলেন তখন তাঁদের সামনে দিয়ে মোহান্ত সম্প্রদায়ের কয়েক জন যাতায়াত করায় 'জাত গেল' এই অজুহাতে তাঁরা আহার বন্ধ করেন। স্বয়ং প্রভু এই কথা শুনে মর্মাহত হয়ে বলেন, "ভক্তের মধ্যে জাতি বুদ্ধি করায় অপরাধ হয়েছে।" সেই অপরাধের শাস্তি নিজ মাথায় তুলে নিয়ে প্রভু পরপর দুদিন নির্জলা উপবাস করেন, তাঁর এই আচরণে ও পরোক্ষ শিক্ষাদানে সকল সম্প্রদায়ের ভক্তদেরই চেতনার উন্মেষ হয়।

ফরিদপুরের বুনো বাগদীদের মত কলকাতার রামবাগানে ডোম জাতিদেরও প্রভু জগবন্ধু এইভাবেই নিজ দিব্যশক্তির আকর্ষণে কাছে টেনে তাদের চেতনার আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। অতঃপর তাদেরও হীনজাতি ও অস্পৃশ্য, এই দুর্নাম দূরীভূত হয় এবং তারা হরিনামে উদ্বুদ্ধ হয়ে কীর্তনে ভাসিয়ে দেয় তাদের জীবন। কালক্রমে তাদের মধ্যে থেকেও বিশিষ্ট কীর্তনীয়া ও মৃদঙ্গ বাদক উঠে আসেন।

শ্রী অতুল চন্দ্র চম্পটি ছিলেন আড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি ছিলেন প্রভু জগবন্ধুর একান্ত ভক্ত। থাকতেন একটি মেসে। একসময় প্রভু ঐ মেসবাড়ীতে পদার্পণ করে অতুলচন্দ্রের ঘরে নিজ হাতে হবিষ্যান্ন পাক করেন। এদিকে প্রভু প্রসাদ গ্রহণের আগেই তাঁর আদেশে অতুলচন্দ্র স্কুলে যেতে বাধ্য হল। পরে বন্ধুসুন্দর তাঁর ভক্তের জন্য কচি কলাপাতায় মুড়ে স্বীয় কৃপাশক্তি সঞ্চারিত কিছু অন্নপ্রসাদ তুলে রাখেন। বাড়ী ফিরে ঐ প্রসাদান্ন আস্বাদনের পরমুহূর্তে অতুলচন্দ্রের মধ্যে তীব্র বৈরাগ্যভাব জেগে ওঠে। গৃহস্থাশ্রম ও স্কুলের চাকরী পরিত্যাগ করে তিনি বন্ধুসুন্দরের চরণে আত্মসমর্পণ করেন।

সাধন জীবনের শুরুতে প্রভু জগবন্ধুর আদেশে অতুলচন্দ্র প্রতিদিন সকাল বেলায় জগন্নাথ ঘাটে গঙ্গাস্নান সেরে করতাল বাজিয়ে "কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ্যাম / রাধা মাধব রাধিকা নাম" এই নাম কীর্তনটি উচ্চৈস্বরে গাইতে গাইতে কালীঘাটে পৌঁছাতেন। সেখানে আদি গঙ্গায় স্নান করে আবার ঐভাবে কীর্তন করতে করতে তিনি ফিরে আসতেন জগন্নাথ ঘাটে। এই টহলব্রত অনুষ্ঠানে অতুলচন্দ্রের নিষ্ঠার কোনো অভাব হয় নি কোনো দিন। পরবর্তীকালে একসময় অতুলচন্দ্রকে প্রভু আধ্যাত্ম পথের আরও দুরূহ পাঠ নেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন পাবনায় হারান ক্ষেপার কাছে। (ক্রমশঃ)

পরিমল রায়

নড়িয়ে ওরা বিশ্বাসের ভিত
নিতে চায় কেড়ে তব সম্বীৎ
করে ঘরের বার-
দেখায় শুধু, স্বর্গ-নরকের দ্বারা,
পাড়িয়ে ঘুম
চায় দিতে, মোহমায়ার সুখ,
ভুলিয়ে তোমা মধুর সুর,
পাঠায় মোরে বহুৎ দূর।
দড়িকে দেখিয়ে সাপ,
মনে বাড়ায় শত সহস্রেক তাপ,
ঐ এক পাপে, বিস্ময়ের তলে,
জন্মজন্মান্তরে হয় না চড়া, তোমা কোলে।
তাইতো তব পদে দিয়ে গড়,
থাকি বসে ঘরের মধ্যে ঘর,
তবে প্রসাদে লভে, "মধুমতী প্রজ্ঞা",
দেখি, সবের মধ্যে একই শোভা।
জেনে তোমায় অন্তময়,
সাজি আমি মধুময়। ❑

অন্তর শুদ্ধ না হলে ঈশ্বর আছেন বলে বিশ্বাসই হয় না। —শ্রীরামকৃষ্ণদেব

সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়

"মনের মানুষকে মন তো কখনও চিনতে করে না ভুল
স্বর্গের পারিজাত হয় যে কখন একটি চামেলীফুল।"

চামেলী মেমসাহেব নামক বাংলা ছবিতে ডঃ ভূপেন হাজারিকার সুরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কন্ঠে এই গানটি ছোটবেলা থেকেই আমাদের আকৃষ্ট করে। গানের প্রথম লাইনটি হল "ও বিদেশী তাকাও সামনে তোমার দেখবে একই আকাশ একই পাহাড়/মাটিতেও নেই ব্যবধান।" যাঁরা এই গান জানেন উপজীব্য। একদিকে বিহু সংস্কৃতি অন্যদিকে কামাখ্যামন্দিরের মাহাত্ম্য, একদিকে খনিজ তৈলের আকর আবার অন্যদিকে চা বাগান কিংবা কাজিরাঙ্গার অরণ্য এসব নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্য আসাম আকৃষ্ট করে আমাকে। এর পাশাপাশি যদি শিলং বা চেরাপুঞ্জি ভ্রমণের সঙ্গে যুক্ত হয় তবে তো সোনায় সোহাগা। তাই বার্ষিক ভ্রমণ সূচীতে এবার যুক্ত করে ফেললাম আসাম, শিলং চেরাপুঞ্জি ভ্রমণ। শুধুই বেড়ানোর ইচ্ছাই নয় এর পাশাপাশি অসমের সংস্কৃতি আস্বাদন করে ঋদ্ধ হব এমনটাই বাসনা। ব্রহ্মপুত্র নদী, কাজিরাঙ্গা অরণ্য এবং শিলঙের পাকদণ্ডীপথ এই ত্র্যহস্পর্শ এবারের ভ্রমণে।

১০।১০।২০১৬ সোমবার। মহানবমীর সকাল। শিয়ালদহ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ধরে চললাম গৌহাটি। বর্ধমান, বীরভূম, মালদা পেরিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ ট্রেন পৌঁছায় নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে। সেখানে অধিকাংশ লোক দার্জিলিং বা গ্যাংটক যাওয়া জন্য নেমে গেলেন। দ্বিপ্রাহরিক, ভোজন, চা, জলখাবার, রাত্রের খাবার—সবকিছুরই ব্যবস্থা ট্রেনে। আশা করা যায় পরের দিন যখন গৌহাটি পৌঁছাব তখন কলকাতায় ঠাকুর দেখার পালা শেষ। খবর পাই যে কলকাতায় খুব বৃষ্টি হচ্ছে। শেষবারের মত সকলেই ঠাকুর দেখে নিতে চান। আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ষা বিদায় নিলেও রেখে যায় তার স্মৃতি। রাত্রে মাঝেমাঝে লোক ওঠে। যেহেতু ভোরবেলায় উঠতে হবে তাই সেখানে ঘুম হয় না। ভোর পাঁচটা নাগাদ গৌহাটি পৌঁছে যাই। আমাদের যে নির্দিষ্ট গাড়ি রয়েছে তার ড্রাইভারকে ফোন করি। সে গাড়ি নিয়ে আসে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত টাটাসুমো নির্ধারিত রয়েছে আমাদের জন্য। লটবহর গাড়িতে তুলে দিই। গাড়ি চলে কাজিরাঙ্গার দিকে। এখন এখানে প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে। সেই বৃষ্টির মাঝেই গাড়ি চলতে শুরু করে। গৌহাটি থেকে কাজিরাঙ্গার দূরত্ব ২১৭ কিলোমিটারের বেশী। জঙ্গল অধ্যুষিত অঞ্চলে খাওয়া ও থাকবার জায়গার কোন অভাব নেই। কার্চিভাষায় কাজিরাঙ্গা শব্দের অর্থ বেশ সুন্দর। যেখানে পাহাড়ি ছাগল জল খেতে আসে তা হল কাজিরাঙ্গা। এটি জাতীয় উদ্যান। পূর্ব পশ্চিম ও মধ্য এই তিনটি রেঞ্জে কাজিরাঙ্গাকে ভাগ করা যায়। তিনটি রেঞ্জের তিনটি প্রবেশদ্বার। একশৃঙ্গ গণ্ডারের জন্য কাজিরাঙ্গার বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। এই অভয়ারণ্যে রয়েছে শিমূল, শিশু, হিজল, গামহার প্রভৃতি বৃক্ষের অরণ্য, পাশাপাশি নানা দুষ্প্রাপ্য অর্কিডের সম্ভার এখানে বর্তমান। অজস্র পাখির সমাবেশ এখানে। ১৯৮৫ সালে কাজিরাঙ্গার অরণ্য ওয়াল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছে। ২০০৫ এ সসম্মানে উদ্‌যাপিত হয়েছে কাজিরাঙ্গার শতবর্ষ। ডিফলু, মোরা, বরজুরি, ভালুকঝুরি ইত্যাদি নদী কাজিরাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে বয়ে চলেছে।

—দেখুন দেখুন সামনে কাজিরাঙ্গা।

আমাদের ড্রাইভার ধনতির কথায় সম্বিত ফিরে পাই। দুপাশে তখন জঙ্গল। এক ফাঁকে একটি সমতলভূমি—তার ওপারেই সবুজ গাছে ঘেরা কাজিরাঙ্গা। দূর থেকে চোখে পড়ে দুটি গণ্ডার। রাস্তায় চলেছে হাতীর দল। তারা আমাদের সামনে আসে। অভিবাদন জানায় কাজিরাঙ্গার পর্যটকদের।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করে। একদিকে জঙ্গল ও মাঝে ছবির মত রিসর্ট। অন্যদিকে চা বাগান। কিছুক্ষণ পরেই আমরা পৌঁছে যাই ছবির মত জে. বি. রিসর্ট। এখানেই আজ আমাদের দুপুরে ও রাতে থাকবার ব্যবস্থা। অত্যন্ত নির্জন এই রিসর্ট। আশেপাশে সামান্য জনবসতি দোকানপাট প্রায় নেই বললেই চলে। রিসর্টে জলখাবারের ব্যবস্থা নেই। এখন বলে রাখলে দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের ব্যবস্থা হতে পারে। বেশ খানিকটা দূরে একটা ছোট্ট দোকানে জলখাবার খাই। চারটি লুচিতরকারী ৩০ টাকা সঙ্গে চা ১০ টাকা। ক্ষুধার্ত জঠরকে শান্ত করে রিসর্টে আসি। তিনতলার ঘরে জায়গা হয়। ঘর, বাথরুম সবই বেশ

সাজানো। স্নানাদি সেরে বিশ্রাম নিই। সারা দুপুর চলে লোডশেডিং। এখানে নাকি দশেরার দিন আলোর সংযোগ কেটে দেওয়া হয়। বিকালে সব ঠাকুর বিসর্জন হয়ে যাওয়ার পর আবার বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে; হোটেলের খাবারের ব্যবস্থা বেশ ভালো। বিকেলে চারপাশে একটু ঘুরতে বেরোই। অন্ধকার, দোকানপাটের অভাব, সর্বোপরি লোকজনের চলাচল নেই। সারাটা সন্ধ্যে কাটে হোটেলে। আগামীকাল হাতীর পিঠে চড়ে জঙ্গল দেখতে যাব। ভোর পাঁচটার সময় শুরু হবে যাত্রা। গাড়ি আসবে হোটেলে ভোর ৪.৪৫ মিঃ নাগাদ। রাতের খাবারের পালা চুকিয়ে বিছানায় যাই। দূর থেকে ভেসে আসে বাদ্যযন্ত্রসহ গানের শব্দ। আসামের লোকসংস্কৃতির আমেজ উপভোগ করি।

১২।১০।২০১৬ বুধবার, ভোর ৪টের সময় ঘুম থেকে উঠি। ড্রাইভার ধনতি তার গাড়ি নিয়ে রিসর্টের কাছে আসে। ৪.৪৫ এর মধ্যে তৈরি হয়ে গাড়িতে উঠে বসি। অসম্ভব দুর্যোগ। ঘূর্ণিঝড় ও তার সঙ্গে সঙ্গে চলে বৃষ্টি। ওয়েস্টার্ন ঘাট অর্থাৎ বাউড়ি অঞ্চলে আমরা যাই। রাস্তায় প্রচণ্ড জলকাদা। একজায়গায় গিয়ে গাড়ি দাঁড়ায়। সেখান থেকে বেশ কিছুটা রাস্তা পায়ে হেঁটে যেতে হবে। পিচ্ছিল রাস্তা। মনে হচ্ছে টাল সামলাতে পারব না। আমাদের যে হাতীর মালিক তার নাম দীপক দাস। ঐ পিচ্ছিল পাথরে খানিকটা এগিয়ে মেলে ওয়াচ টাওয়ার। তার ওপর উঠে চড়তে হবে হাতীর পিঠে। শুনলাম মোট ১৫টি হাতী সকাল ৫টা থেকে ৬টা, ৬টা থেকে ৭টা ও ৭টা থেকে ৮টা এই তিনবার জঙ্গলে সওয়ারি নিয়ে যায়। প্রত্যেকের পিঠের ওপর হাওদা। তার ওপর চেপে বসি। মোট পাঁচজন বা ছজন করে বসবার জায়গা। দুলকিচালে গজরাজ চলেন। জলাভূমি পূর্ণ জঙ্গলে হরিণ দেখা যায়। হঠাৎ চোখে পড়ে একশৃঙ্গ গণ্ডার। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের জামাকাপড় যাচ্ছে ভিজে। সব থেকে বড় কথা এই জোর হাওয়াতে ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি তোলা যাচ্ছে না। যে মাহুত হাতীকে নিয়ন্ত্রণ করছেন তাঁর দক্ষতারও প্রশংসা করতে হয়। মাত্র একঘন্টা সময়—তাও যে কিভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। জঙ্গলের সফর শেষ করে আমরা আবার ওয়াচ টাওয়ারে ফিরে আসি। পরের ঘন্টার লোকজন সারিবদ্ধভাবে গজরাজের পিঠে চাপবার জন্য দাঁড়ায়। প্রায় চান করে গিয়েছি বৃষ্টির জলে। তবু হোটেলেই আবার স্নান করি। সেখানেই জলখাবারের ব্যবস্থা। সেসবের পালা চুকিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে বসি গাড়িতে। চলি গৌহাটিতে।

রাস্তায় একটি ধাবাতে দ্বিপ্রাহরিক ভোজনপর্ব মেটাই। এখানে সব হোটেলেই আক্ষরিক অর্থে পঞ্চব্যঞ্জনের ব্যবস্থা ভাত, ভাজা, ডাল, সব্জি, আচার, সব মিলিয়ে প্রায় দশরকম জিনিস পাতে পড়ে। সেসবে বড় তৃপ্তি পাই। পাকদণ্ডী পথ। মেঘকে যেন হাতের মধ্যে ধরতে পারছি। মনে হচ্ছে আমরা যেন উত্তরবঙ্গ সফর করছি। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির ঝাট। আমরা প্রবেশ করছি গৌহাটির পথে।

রাজ্যটির নাম ছিল আসাম। বর্তমানে এর নাম অসম। যদি পুরাণের প্রসঙ্গ আনা যায় তাহলে দেখব যে তখন এই অঞ্চলের নাম ছিল প্রাগজ্যোতিষপুর। দানবরাজ নরকাসুরের হাতে এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এই রাজ্যের আরও একটি নাম হল কামরূপ। এই কামরূপ নামের পেছনে আছে একটি কাহিনী। সতীর দেহত্যাগের পর শোকাতুর মহাদেব নীলাচল পাহাড়ে তপস্যায় বসেন। দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে মদনদেব বা কামদেব শিবের মনে কামভাবের উদ্রেক করবার জন্য সেখানে এলেন। ক্ষুব্ধ শিব তৎক্ষণাৎ মদনকে ভস্ম করে দিলেন। তখন কামদেবের স্ত্রী রতি শিবকে তুষ্ট করলেন ও কামদেবতার রূপ ফিরে পেলেন। সেই থেকে এখানকার নাম হল কামরূপ।

থাইল্যাণ্ড থেকে শান বৌদ্ধ অহোমরা এসে ১২২৮ সালে এই ভূখণ্ডর দখল নেয়। কথিত রয়েছে যে, অসম এই শব্দটি অহম থেকে এসেছে। আবার অনেকে বলেন যে অ-সম শব্দ থেকে অসম এসেছে। ১৮২৬ সাল পর্যন্ত অহোমদের দখলে থাকে অসম। এরপর নিযুক্ত হয় ভাইসরয়। পরবর্তীকালে ইতিহাসের নানা উত্থানপতনে ১৮৩৯ সালে অসম বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে বঙ্গভঙ্গের সময় পূর্ব বাংলার সঙ্গে আসামের মিলন ঘটে। অসম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, মেঘালয়। এভাবেই বর্তমানে অসম পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কয়লা, চুনাপাথর, পেট্রোল প্রাকৃতিক গ্যাস, সিমেন্ট—এসব আসামে প্রচুর। পাশাপাশি

দুটি কুঁড়ি একটি পাতার চা বাগান আসামের আরও এক সম্পদ। গোয়ালপাড়ার লোকশিল্প জগদ্বিখ্যাত। বিহু উৎসব আজ বিশ্ববন্দিত। রাজা বিশ্ব সিং-এর নামানুসারে বিশ্ব বা বিহুর সূচনা। বিহু উৎসব হয় তিনটি সময়। চৈত্র সংক্রান্তিতে ৩দিন ধরে বোহাগ বিহু বা বঙালি বিহু, কার্তিকমাসে কাঙালি বা কাটি বিহু এবং ভোগলিবিহু বা মাঘবিহু। নাচে গানে মেতে থাকেন আসামের অধিবাসীরা। লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া, ডঃ ভূপেন হাজারিকা, ইন্দিরা গোস্বামী, ভবেন্দ্রনাথ। শইকিয়া, নবকান্ত বড়ুয়া, জয়ন্ত হাজারিকা এবং সর্বোপরি গৌরিপুর রাজবাড়ির প্রমথেশ বড়ুয়া, প্রকৃতিশ বড়ুয়া, প্রতিমা বড়ুয়া আসামের সংস্কৃতিকে সারা ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের কোণে কোণে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

গুয়াহাটি বা গৌহাটি আসামের অন্যতম প্রধান শহর। গুয়াহাটি নামের অর্থও ভারী সুন্দর। গুয়া অর্থে সুপারি আর হাটি হচ্ছে হাট। অর্থাৎ গুয়াহাটি হল গুয়া বা সুপারির হাট। অসম এবং সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতের দরজা বলা যায় এই গৌহাটিকে। শোনা যায় দৈত্যরাজ নরকাসুরের সময় এই শহর গড়ে উঠেছিল।

আমরা ঢুকে পড়েছি গৌহাটি শহরে। অত্যাধুনিক ঝাঁ চকচকে না হলেও গৌহাটি শহরও খুব আধুনিক নয়। বিশাল বিশাল ইমারত, হোটেল। বড় বড় দোকান এসব নিয়ে গৌহাটি শহরে রয়েছে অসংখ্য উড়ালপুল। সেসব উড়ালপুল পেরিয়ে গৌহাটির স্টেশন লাগোয়া পানবাজার এলাকায় মিনার্ভা হোটেলে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা। কিন্তু তার আগে আমরা এসে দাঁড়াই গৌহাটির বিখ্যাত বিজ্ঞান সংগ্রহালয়ের সামনে। ১৯১৩ সালে আসামের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ এই প্রদর্শনশালার উদ্বোধন করেন। একই ছাদের তলায় তারামণ্ডল, মহাকাশ, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন জীববিদ্যা, অংকের নানা খেলা—সবকিছুই মজুত। রয়েছে ছোটদের ভালো লাগবে এমন বেশ কিছু খেলার জায়গা। অ্যাকোয়ারিয়াম, প্রাগৈতিহাসিক জীবের প্রদর্শনী মুগ্ধ করে আমাকে। সব থেকে ভালো লাগে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রমুখ বাঙালী বিজ্ঞানীদের আবক্ষমূর্তি এবং তাঁদের নানাকীর্তি কাহিনী কত যত্ন করে প্রদর্শিত হচ্ছে এখানে। মাত্র ২০ টাকার বিনিময়ে এই অসামান্য বিজ্ঞান প্রদর্শনশালা দেখে চমৎকৃত হই।

এরপর আমাদের গন্তব্য মিনার্ভা হোটেল। সেখানে পৌঁছাই। আজ মহরম হলেও কোন যানজট নেই এখানে। এবার নৈশাহার সেরে বিছানায় যাওয়ার পালা। (ক্রমশঃ)

তোমার কথা....

দীপক দাশগুপ্ত

সবুজ পাহাড় বুক পেতেছে
ঝর্ণা তোমার শুনতে গান
ঝালং নদীর জলের স্রোতে
মোহন বাঁশির বাজছে তান।
মরুভূমির বালির ঝড়ে
চোখ বুজেছি—কান খুলেছি
সেথাও বাজে মোহন বাঁশি
রুদ্র সুরের গভীর তান।

সাগরেতে ঢেউ উঠেছে
শব্দ ব্রহ্ম যেথায় নাচে
প্রাণের দুয়ার খুলে রেখে
শুনছি সেথায় তোমার গান।

মেঘমুলুকে বজ্রপাতে
তোমার বাণী জাগছে রাতে
নিদ্রা ভেঙ্গে চমকে উঠি
শব্দ ব্রহ্ম হচ্ছে সৃষ্টি।

তোমার হাসি, তোমার কান্না,
তোমার কথা, তোমার ব্যথা,
সবই তুমি, সবই তুমি
এই সুখেতেই বাঁচি আমি।। ❑

নিবেদন ক'রে খাওয়ায় আহার শুদ্ধ হয়ে যায়। প্রসাদ খেলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। মানুষ ভোগের বস্তু গ্রহণ না ক'রে তো থাকতে পারবে না, কাজেই ভগবানকে নিবেদন ক'রে গ্রহণ করা অনেক ভাল। —**শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব**

তোমরা পূজার ঘরটিকে ধূপে, সুরভিতে, ফুলে, নামে, গানে, ঠাকুরের মূর্তিতে এমন করে ভরিয়ে রাখবে—যেখানে ঢুকলেই মনটা আপনি উঁচু স্তরে উঠে যাবে।

—শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব